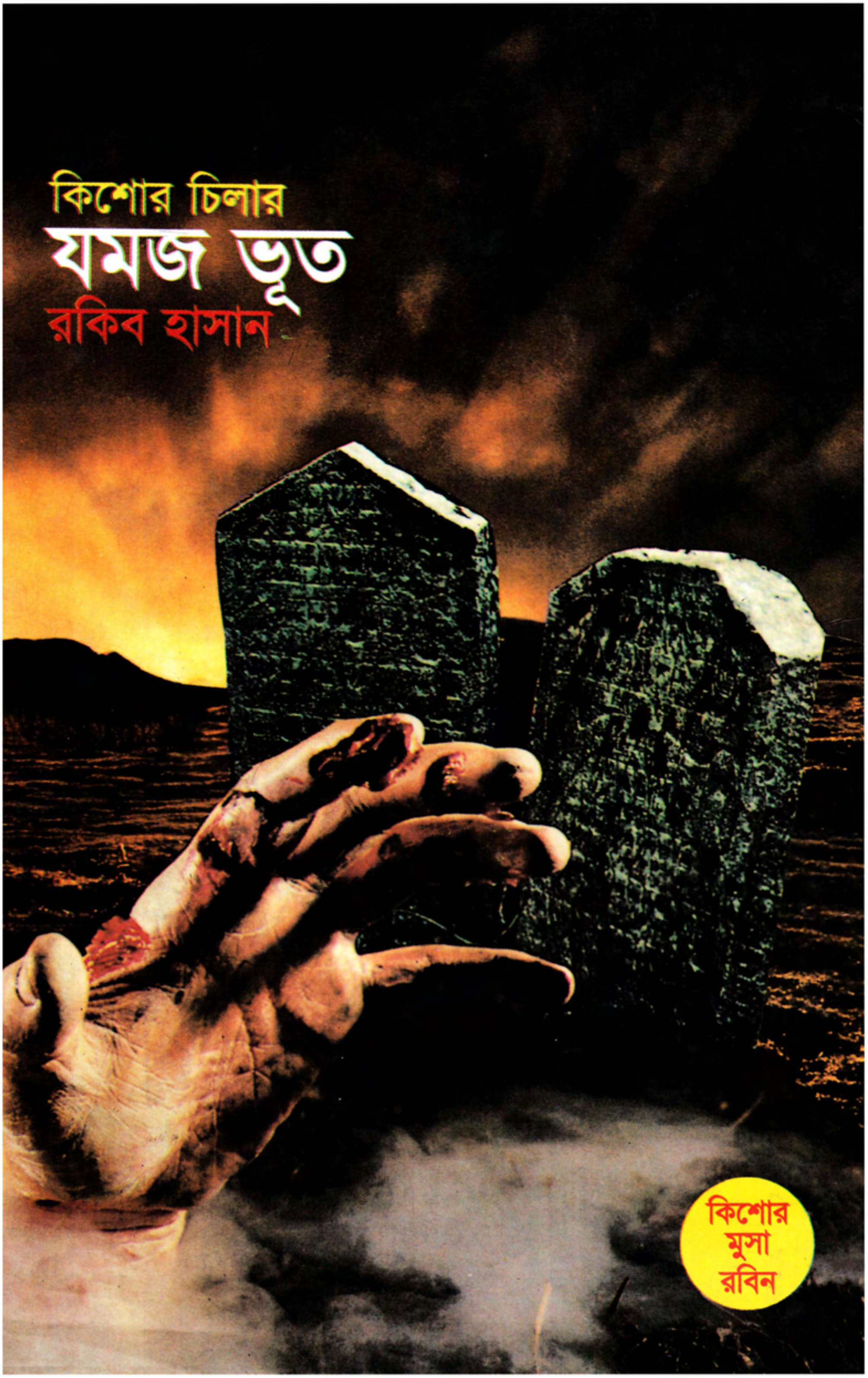
কিশোর থ্রিলার
যমজ ভূত
রকিব হাসান
কিশোর
মুসা
রবিন

তিন বন্ধু

কিশোর চিলার

যমজ ভূত

রকিব হাসান

প্রজাপতি প্রকাশন

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব: লেখকের
প্রথম প্রকাশ
প্রজাপতি প্রকাশন: ২০০২
প্রচ্ছদ
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১ ৪১৮৪
E-mail: sebaprok@citechco.net
একমাত্র পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশনী
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

JAMOJ BHOOT
By: Rakib Hassan
ISBN 984-462-301-4
মূল্য: তেত্রিশ টাকা

পরিচয়

প্রিয় পাঠক বন্ধুরা–
'তিন বন্ধু'র তরফ থেকে তোমাদের স্বাগতম।
আমি কিশোর পাশা বলছি।
নতুন যারা, আমাদের পরিচয় জানো না,
তাদের জানাই: আমি বাঙালী।
আমার এক বন্ধু মুসা আমান, আমেরিকান নিগ্রো।
অন্যজন রবিন মিলফোর্ড, আইরিশ আমেরিকান।
'তিন গোয়েন্দা' হিসেবে আমরা পরিচিত।
আমাদের মূল ঘাঁটি আমেরিকার রকি বীচে।
রহস্য ও অ্যাডভেঞ্চারের খাতিরে যে-কোন জায়গা,
যে-কোন শহর, যে-কোন সময়ে, এমনকি যে-কোন গ্রহেও
চলে যেতে পারি আমরা।
পুরানো পাঠকরা, প্লীজ, 'চিলার'-এর সঙ্গে
'থ্রিলার'-কে গুলিয়ে ফেলো না।
এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা সিরিজ। এ বইয়ে মনে হবে
অনেক কিছুই উদ্ভট, অবাস্তব, অতিপ্রাকৃত।
কিন্তু কি প্রয়োজন চুলচেরা বাস্তব বিশ্লেষণের–
মজা পাওয়াটাই আসল কথা, তাই না?

এক

এক অদ্ভুত গল্প শোনাব আজ তোমাদেরকে।
দানবের গল্প।
প্রশ্ন করতে পারো, দানব কি সত্যি সত্যি আছে?

এর জবাবে বলতে পারি, যে জিনিস চোখে দেখা যায় না, সেসবে বিশ্বাস জন্মানো কঠিন হয়ে ওঠে, কিন্তু তাই বলে কি মানুষ ভূতে বিশ্বাস করে না?

করে। অনেকেই। তবে ভূতের ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। এগুলো চোখে দেখা যায় না। তাই কেউ বিশ্বাস করে ভূত আছে, কেউ করে না।

আর দানব? সেগুলোও কেউ দেখেনি। কিন্তু দানবীয় প্রাণী যে আছে, এ ব্যাপারে অনেক গবেষকই একমত। দানব বলতে এই যেমন, আমেরিকার সাসকোয়াচ, বিগফুট, হিমালয়ের ইয়েতি এসব। আরও কয়েক ধরনের দানব আছে, যেগুলোর কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেলেও দেখা-সাক্ষাৎ তেমন মেলে না। এর কারণ, গবেষকদের বিশ্বাস, মানুষকে সবাই ভয় পায়। দানবরাও। তাই সামনে আসে না। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ভয়ে। পালিয়ে পালিয়ে থাকে পর্বতের গভীরে গহন অরণ্যে, দুর্গম মরুভূমিতে, কিংবা সাগরের তলায়।

একটা কথা চুপি চুপি বলে রাখি, কাউকে বোলো না কিন্তু, আমরা বেশ কিছু দানব দেখেছি। তাদের সঙ্গে টক্করও লেগেছে আমাদের। বহু কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি। আর ভূত? হাহ্ হাহ্ হা! মুসা বিশ্বাস করে। আমি করি না। আর রবিন করা না করার মাঝামাঝি অবস্থানে, এই তো তোমরা জানো। কিন্তু সত্যি কথাটা শুনলে চমকে যাবে···যাকগে, আর ভণিতা না করে গল্পটা শুরু করা যাক।

এতক্ষণে নিশ্চয় অনুমান করে ফেলেছ আমি কে। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, আমি কিশোর। কিশোর পাশা।

এ গল্প যখনকার তখনও 'তিন গোয়েন্দা' গঠন করিনি আমরা। বয়েস এখনকার চেয়ে অনেকটাই কম ছিল। তাই স্বভাব-চরিত্রও কিছুটা অন্য রকম ছিল–খুব ছোটবেলায় যে রকম থাকে মানুষের। অতিরিক্ত চঞ্চল। অতিরিক্ত ছেলেমানুষী। কথায় কথায় ঝগড়া। কথায় কথায় খুনসুটি। অথচ তিনজনেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছি আমরা ততদিনে। তোমরা আমাদের বর্তমান আচরণে অভ্যস্ত, তাই এত কথার অবতারণা। আমাদের সেই

বয়েসের কাণ্ডকারখানায় যাতে বিরক্ত কিংবা অবাক না হও। আর হলেও কিছু করার নেই। বুকে হাত দিয়ে কি বলতে পারবে, অনেক ছোটবেলায়ও ঠিক এখনকার মতই ছিলে তোমরা?

পারবে না। আমি জানি। যাকগে, বহুত বকবক করা হলো। এবার আসল কথায় আসি।

'মনস্টারল্যান্ড পার্ক'-এর গেট দিয়ে ঢোকার সময়ও কল্পনা করিনি, প্রাণ হাতে করে এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করতে হবে আমাদের। দানবের পার্কে যাওয়ার আমাদের ইচ্ছে ছিল না। এ রকম একটা পার্ক যে আছে তা-ই জানতাম না।

কি করে জানলাম শুনতে চাও? বলছি। আমার বলা আমি বলে যাচ্ছি, বিশ্বাস করা না করা তোমাদের ব্যাপার।

ঘটনার শুরু একটা পুরানো কবরস্থানে। রকি বীচে বাস করলে ইনডিয়ানদের পুরানো কবরস্থানটার নাম তুমি জানবেই। তবে সেখানে যেতে ইচ্ছে করবে কি করবে না সেটা নির্ভর করবে তোমার কৌতূহলের পরিমাণের ওপর। বেশি কৌতূহল হলে না গিয়ে থাকতে পারবে না—কারণ ওটাকে ঘিরে এমন সব গুজব আর রূপক গল্প কানে আসতে থাকবে তোমার, খালি মনে হবে, যাই দেখে আসি একবার। আমার বেলায়ও হয়েছিল সেটাই।

ঝলমলে রোদেলা দিনেও কবরস্থানটায় ঢুকলে মনে হবে রোদ কেমন মরা মরা। পাহাড়ের ছায়া পড়ে থাকে সারাক্ষণ নিচের রাস্তা, ঘরবাড়ি, গাছপালার ওপর।

নিচে থেকেই চোখে পড়বে তোমার, পাহাড়ের ওপরের সারি সারি কবরফলক। বড় বড় সবুজ ঘাসের মধ্যে ওগুলোকে দেখতে লাগে নষ্ট দাঁতের মত। ছাতলা পড়া, ফ্যাকাসে রঙ।

কবরস্থানটার ব্যাপারে গুজব শুনতে শুনতে একদিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, যাব দেখতে। যা থাকে কপালে।

এক ছুটির দিনে সকালে রওনা দিলাম। কবরস্থানে গিয়ে দেখলাম রাতের শিশিরে ভেজা ঘাস তখনও শুকায়নি। ভাপ উঠছে মাটি থেকে। কেমন বিমর্ষ আর থমথমে পরিবেশ।

আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। সাদা মেঘের ভেলা নেই। ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল নীলের ছোঁয়া নেই। যতদূর চোখ যায় আকাশ যেন ধূসর এক মস্ত চাদর।

পাহাড়ের ওপর থেকে ধেয়ে এল কনকনে ঝোড়ো বাতাস। পাতাঝরা, কঙ্কালের মত শীর্ণ রুক্ষ গাছগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। ডালগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ল আমার দিকে, যেন বলতে চাইল: বাঁচতে চাইলে পালাও!

কালো হয়ে এল আকাশ।

কিন্তু পালালাম না আমি। বরং কুখ্যাত কবরস্থানের পাথরে তৈরি

পুরানো কবরফলকগুলোর মাঝখান দিয়ে এগোতে লাগলাম পা টিপে টিপে, নিঃশব্দে। যেন শব্দ করলেই ঘুম ভেঙে যাবে মরা মানুষগুলোর। দল বেঁধে আক্রমণ করতে আসবে আমাকে।

যে বিশাল কবরটার কথা বলতে বসেছি, দূর থেকেই সেটা চোখে পড়ল।

কাছে যেতে বুঝলাম, একটা নয়, দুটো কবর এখানে। পাশাপাশি গা ঘেঁষে বসানো একজোড়া কবরফলক। কিংবা বলা যায় এক কবরের দুই ফলক। দুই জনের নাম লেখা। নিচে একটা পাখির ছবি আঁকা, কাকের মত দেখতে। তার নিচে লেখা: **আমাদের শান্তি ভঙ্গ করতে চাইলে করো, কিন্তু তারপর যা ঘটবে তার জন্যে নিজেরাই দায়ী থাকবে!**

নাম দুটোর পাশে লেখা: এরা যমজ ভাই। ইনডিয়ান। বেঁচে থাকতে জাদুকর ছিল। মরে গিয়েও জাদুকরই রয়েছে। কবর ফলকে হাত দেবে না–সাবধান!

কিন্তু কোন কাজ আমাকে করতে নিষেধ করা হলে সেটা যেন আরও বেশি করে করতে ইচ্ছে করে আমার। একবার দ্বিধা করে হাত দিয়ে বসলাম ফলকে। শুধু দিয়েই ক্ষান্ত হলাম না, নিচু হয়ে ঝুঁকে দুই হাতে ধরে টানতে শুরু করলাম।

পড়ে গেল ফলকটা। একসঙ্গে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল অনেকগুলো। ফলকটা আরেকটু হলেই আমার পায়ের ওপর পড়ত। ওটা কাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁক হয়ে যেতে শুরু করল 'যমজ কবর'। লাফিয়ে সরে দাঁড়াতে গিয়ে আমি পড়ে গেলাম কবরের গর্তে।

চিৎকার করারও সময় পেলাম না। মাথার ওপর ট্র্যাপডোরের মত বন্ধ হয়ে গেল কবরের ফাঁক। আটকা পড়লাম ইনডিয়ান যমজ জাদুকরদের কবরে। মৃত্যুর নীরবতা আর অন্ধকার যেন গ্রাস করল আমাকে।

একটা মুহূর্ত।

তারপর হঠাৎ করেই যেন আলো জ্বলে উঠল। দিনের আলো। নিজেকে আবিষ্কার করলাম একটা গাড়ির মধ্যে।

*

আমার চাচা রাশেদ পাশার ছোট্ট টয়োটা গাড়িটায় গাদাগাদি করে বসেছি আমরা। থিম পার্কের জু গার্ডেন দেখতে চলেছি। শুরুতেই একটা ভুল করে বসেছে চাচা। ম্যাপটা বাড়িতে ফেলে এসেছে, যেটা দেখে দেখে পথ চিনে জু গার্ডেনে যাবার কথা আমাদের। মনে পড়ার পর আনার জন্যে ফিরেও যেতে চাইল চাচা, কিন্তু আমার মেরিচাচী বলল, যাওয়ার দরকার নেই। এতবড় একটা পার্ক, ম্যাপ ছাড়াও সহজেই খুঁজে বের করে ফেলা যাবে। পার্কের কাছাকাছি হলে পথনির্দেশনা দেয়ার জন্যে প্রচুর সাইনবোর্ড পাওয়া যাবে।

কিন্তু এতখানি পথ চলে এলাম, একটা সাইনবোর্ডের চিহ্নও চোখে

পড়ল না।

চাচা গাড়ি চালাচ্ছে। চাচী বসেছে তার পাশের সীটে। পেছনে গাদাগাদি করে বসেছি আমরা তিন বন্ধু–মুসা আর রবিন দুই পাশে, আমি তাদের মাঝখানে।

মুসা বকবক করেই চলেছে। একনাগাড়ে বসে থাকতে ভাল লাগছে না তার। একঘেয়ে এই চলা রবিনও পছন্দ করতে পারছে না। আমারও ভাল লাগছে না।

আর কিছু না পেয়ে রবিনকে প্রস্তাব দিয়ে বসল মুসা, 'এসো, পাঞ্জা লড়ি। বুদ্ধির লড়াইয়ে কখনও তোমাদের সঙ্গে পেরে উঠি না। দেখা যাক, শক্তিতে কে পারে।'

মুসাই পারবে, জানা কথা, কারণ আমাদের তিনজনের মধ্যে খায়ও বেশি সে, গায়েগতরেও বড়। ভেবেছিলাম, রাজি হবে না রবিন। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে সত্যি সত্যি রাজি হয়ে গেল সে। আমি বসেছি মাঝখানে, সুতরাং আমার উরু দুটোকে পাঞ্জা লড়ার টেবিল বানাল ওরা। এমনিতেই নেই গাড়ির ভেতরে জায়গা, তার ওপর দু'জনের দুটো কনুইয়ের চাপ আমার উরুর ওপর, বোঝো ঠেলা। যতটা না বিরক্ত হয়ে, তারচেয়ে বেশি ব্যথায়–চেঁচানো শুরু করলাম।

পোলাপানের খুনসুটিতে সাধারণত বিরক্ত হয় না চাচী। ঘুরে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে পরামর্শ দিল, 'এ সব ধস্তাধস্তি করার চেয়ে অক্ষর নিয়ে খেলো না কেন? বাইরে তাকালে প্রচুর অক্ষর দেখতে পাবে।'

'কই, কোন অক্ষরই তো দেখছি না,' জবাব দিল মুসা। 'সাইনবোর্ডই নেই। অক্ষর আর পাব কোথায়?'

রবিন বলল, 'আর সাইনবোর্ড। দেখারই কিছু নেই।'

ঠিকই বলেছে ও। এক ধরনের মরু অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে চলেছি আমরা। বালি আর বালি। বালির দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। মাঝেসাঝে একআধটা নিঃসঙ্গ গাছ কিংবা রুক্ষ ঝোপ যেন কড়া রোদে ধুঁকছে।

'সামনে সরে যাওয়ার যে রাস্তাটা প্রথম পাব সেটাতেই সরে যাব,' চাচা বলল। মাথার শিকাগো কাবস ক্যাপটা খুলে নিয়ে চাঁদি চুলকাল। 'কিন্তু একটা রাস্তায় তো ইতিমধ্যেই সরলাম, লাভটা কি হলো?'

কেউ জবাব দিল না।

'আমার ধারণা জায়গাটার খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা,' আবার বলল চাচা। কিন্তু গলায় জোর নেই তার।

'বলা কঠিন,' চাচী জবাব দিল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। 'মরুভূমি ছাড়া আর তো কিছু দেখছি না।'

'খানিকটা ভরসা দিলেও তো পারো,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল চাচা। 'ভাল কথা কি মুখে ওঠে না?'

'কি করে উঠবে?' ঝাঁঝিয়ে উঠল চাচী। 'ম্যাপটা রান্নাঘরের টেবিলে

তুমি ফেলে এসেছ। আমি না।'

'আমি তো ভেবেছি তুমি ওটা নিয়েছ,' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল চাচা।

'আমি নিতে যাব কেন? ওটা কি আমার কাছে ছিল?' চাচী বলল।

'ইস্, ঝগড়াটা থামাও না তোমরা,' চেঁচিয়ে উঠলাম। ঝগড়া সাধারণত বাধায় না দু'জনে। কিন্তু একবার বাধালে আর থামতেও চায় না। সময়মত বাধা না দিলে এখন সেই অবস্থায় চলে যাবে বুঝতে পারছি।

থামল ওরা। তারপর সবাই চুপচাপ।

বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারল না মুসা। আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি হলামগে ম্যাড পিঞ্চার!' তারপর হরর সিনেমার ভিলেনের কণ্ঠ নকল করে হহ্-হহ্ করে হেসে উঠল সে। চিমটি কাটল রবিনের বাহুতে।

মুসার এই ম্যাড পিঞ্চারগিরিতে অন্য সময় মজা পেলেও এমুহূর্তে ভীষণ বিরক্ত লাগল আমার। রবিন হাসল না। আমিও না। নিজের রসিকতায় নিজেই হা-হা করে হাসতে লাগল মুসা। কিন্তু কেউ তার সঙ্গে যোগ না দেয়ায় একসময় চুপ হয়ে গেল।

প্রচণ্ড গরম হয়ে উঠেছে গাড়ির ভেতরে। এই আবহাওয়া আর একঘেয়েমিতে মগজও তেতে উঠছে সবার। সবাই বুঝতে পারছে সেটা। সেজন্যে কারোরই ভাল লাগছে না।

রসিকতা করে হাসানোর চেষ্টা করল চাচা।

বিরক্ত কণ্ঠে বলে দিলাম, 'চাচা, তোমার ওসব পচা রসিকতা বন্ধ করো! ভাল্লাগছে না!'

রেগে গেল চাচা। আমার ওপর নয়। পরিস্থিতির ওপর রাগ। থিম পার্কটা খুঁজে বের করতে পারছে না বলে রাগ।

'চেঁচামেচি না করে চুপ থাকো না সবাই!' চাচী বলল। 'মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে!'

আবার খানিক চুপচাপ থাকার পর আচমকা চেঁচিয়ে উঠল চাচী, 'এই দেখো দেখো, ওই যে সামনে একটা সাইনবোর্ড!'

প্রায় একসঙ্গে জানালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমরা। ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি করে দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম।

স্টিয়ারিং হুইলের ওপর থুতনি নামিয়ে গলা লম্বা করে উইন্ডশীল্ড দিয়ে সামনে তাকাল চাচা।

'পার্কটা কোথায় লেখা আছে নাকি?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'আমরা কোনখানে রয়েছি, বোঝা যায়?' রবিনের প্রশ্ন।

আরও কাছে এগোলে বোঝা গেল কি লেখা রয়েছে: **সাইন ফর রেন্ট।**

হতাশার গোঙানি বেরোল সবারই।

'একটা অনন্ত যাত্রায় বেরিয়েছি আমরা,' চাচা বলল। 'কোনদিন শেষ হবে না এ পথের। ফিরে যাওয়া দরকার। হাইওয়েতে উঠতে হবে। তবে হাইওয়ে পাব কিনা সে-ব্যাপারেই তো এখন সন্দেহ হচ্ছে।'

'কাউকে জিজ্ঞেস করে নিলে কেমন হয়?' চাচী বলল।

'কাকে করব?' রেগে গেল চাচা। 'রাস্তায় এমন কাকে দেখলে যে জিজ্ঞেস করব?' এক হাতে গাড়ি চালাচ্ছে, আরেক হাত মুঠোবদ্ধ করে ঝাঁকাচ্ছে।

'না, রাস্তায় দেখিনি,' বিড়বিড় করে বলল চাচী। 'তবে সামনের গ্যাস স্টেশনটাতে তো লোক থাকবে।'

'গ্যাস স্টেশন? একটা গাছ পর্যন্ত চোখে পড়ছে না, গ্যাস স্টেশন পাব কোথায়!' গজগজ করতে লাগল চাচা।

চাচা ঠিকই বলেছে। সামনে তাকিয়ে কোন কিছু চোখে পড়ল না আমার। শুধু বালি আর বালি। সাদা ধবধবে বালি। রাস্তার দু'পাশেই। তাতে রোদ চমকাচ্ছে। যেন ক্রূর হাসি হাসছে আমাদের উদ্দেশে। বালি এত উজ্জ্বল, তুষারের মত লাগছে।

'উত্তর দিকে যেতে চেয়েছিলাম আমি,' চাচা বলল। 'মরুভূমিটা রয়েছে দক্ষিণে। কোনদিকে যাব বুঝতে পারছি না।'

'আমি পারছি,' জবাব দিল চাচী। 'উল্টো দিকে। গাড়ি ঘোরাও।'

'পথ হারিয়েছি নাকি আমরা?' জিজ্ঞেস করল মুসা। তার কণ্ঠের ভয় চাপা থাকল না।

ভয় আমরা সবাই পেতে আরম্ভ করেছি। ওকে একা দোষ দিয়ে লাভ নেই।

'সত্যি কি পথ হারিয়েছি আমরা, আঙ্কেল?' রবিনও একই প্রশ্ন করল।

জবাব না দিয়ে আর পারল না চাচা। বলল, 'হ্যাঁ, পথ হারিয়েছি। আর খুব ভালমতই হারিয়েছি।'

অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল মুসার মুখ থেকে। চঞ্চলতা আর দুষ্টুমি উধাও হয়ে গেল চেহারা থেকে। হতাশ ভঙ্গিতে সীটের ওপর নেতিয়ে পড়ল সে। ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল যেন।

'এ ভাবে কথা বলছ কেন?' চাচী বলল। 'ভয় দেখাচ্ছ কেন ছেলেগুলোকে?'

'তো কি ভাবে বলব?' নরম হলো না চাচা। 'জু গার্ডেনের ধারেকাছেও নেই আমরা। সভ্য জগৎ থেকে বহুদূরে। মরুভূমির মাঝখানে রয়েছি। কোন্‌দিকে যেতে হবে জানি না।'

'ঘোরো। সোজা উল্টো দিকে ঘুরে এগোতে থাকো, কাউকে না কাউকে পেয়েই যাব জিজ্ঞেস করার জন্যে,' চাচী বলল। 'আর রাগারাগিটা বন্ধ করো দয়া করে। খেপামো থামাও।'

'তারমানে মরুভূমিতে মারা যাচ্ছি আমরা,' অদ্ভুত স্বরে বলল মুসা। রসিকতা করছে, না সত্যি বলছে, বোঝা যাচ্ছে না। 'শকুনেরা আমাদের চোখ ঠুকরে খাবে। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে গায়ের মাংস।'

'ভয় দেখাতে চাইছ তো?' রবিন বলল ভোঁতা স্বরে। 'পারবে না। এত

সহজে ভয় পাব না আমি।' কিন্তু তার চেহারাই বলে দিচ্ছে, ভয় সে পেয়েছে। চশমার আড়ালে ঘন ঘন পিটপিট করছে তার চোখ। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, রবিনের চোখের পাওয়ারে কি যেন গোলমাল দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে এ রকম হয় তার। সোজা কথা, চোখে তার রোগ আছে। তবে এটা সেরেও যায়। তখন চশমা না পরলেও চলে।

আনমনে বিড়বিড় করতে করতে গাড়ির গতি কমাল চাচা। তারপর ঘোরাতে শুরু করল। যেদিক থেকে এসেছি আমরা সেদিকে ঘুরল আবার। দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে বিরক্তি প্রকাশ করল, 'কোন কুক্ষণে যে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম আজ।'

'এখনও সকাল,' হাতঘড়ি দেখে চাচী বলল।

তবে সকাল শেষ হয়ে আসছে। খোলা সানরূফের ভেতর দিয়ে কড়া রোদ খাড়া এসে পড়ছে চোখেমুখে।

আরও আধঘণ্টা একটানা গাড়ি চালাল চাচা। খেলার মেজাজ নেই আর এখন মুসার। জানালা দিয়ে আর সবার মতই বাইরে তাকিয়ে আছে। রবিন একেবারে চুপ। তবে মুসা চুপ থাকতে পারছে না। একটু পর পরই প্রশ্ন করছে, 'আমরা কি সত্যি সত্যি পথ হারিয়েছি?'

'হারিয়েছি,' প্রতিবারেই একই জবাব দিচ্ছে চাচা।

'অত ভয়ের কিছু নেই,' অবশেষে আশ্বস্ত করল চাচী। 'ঠিক হয়ে যাবে সব।'

আস্তে আস্তে রাস্তার দু'পাশে আবার দু'চারটা করে গাছ দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে পেছনে ফেলে এলাম মরুভূমি। এখান থেকে ঘাসে ঢাকা মাঠের শুরু। আর নিচু নিচু ঝোপঝাড়।

চুপ করে তাকিয়ে আছি বাইরের দিকে। আমার ভয়ও লাগছে না তেমন, উদ্বিগ্নও হইনি। কিন্তু একটা গ্যাস স্টেশন, নিদেনপক্ষে একআধজন মানুষ দেখার জন্যে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে।

'আমার খিদে পেয়েছে,' আচমকা ঘোষণা করে বসল মুসা। 'লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে, তাই না?'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে রাস্তার পাশে গাড়ি রাখল চাচা। চাচীর দিকে হাত বাড়িয়ে গ্লাভ কম্পার্টমেন্টটা দেখাল, 'দেখো তো, ম্যাপট্যাপ আছে বোধহয় ওখানে।'

'নেই,' মাথা নেড়ে চাচী জানাল, 'অনেক আগেই দেখা হয়ে গেছে আমার।'

চাচা-চাচী যখন কথা বলছে, হঠাৎ ওপর দিকে চোখ পড়ল আমার। গাড়ির খোলা ছাত দিয়ে দেখতে পেলাম, ভয়ঙ্কর এক দানব তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। বিরাট মাথাটা নামিয়ে আনছে, যেন মাথা দিয়ে বাড়ি মেরে গাড়িটাকে ভেঙে দেয়ার জন্যে।

দুই

চিৎকার করার জন্যে আপনাআপনি হাঁ হয়ে গেল আমার মুখ। শব্দ বেরোল না।

সানরুফ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে দানবটা। একটা দোতলা বাড়ির সমান উঁচু। লাল টকটকে চোখে রাজ্যের শয়তানি। ক্ষুধার্ত হাসিতে বিকৃত হয়ে আছে মুখ।

'চা-চাচা!' বলতে গিয়ে তোতলাতে শুরু করলাম। গ্লাভ কম্পার্টমেন্টের ওপর ঝুঁকে তখন কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে চাচা।

'খাইছে!' কানে এল মুসার চিৎকার।

ঘুরে দেখি মুসাও তাকিয়ে আছে দানবটার দিকে। আতঙ্কে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ।

'চাচা! চাচী!' এমন করে বললাম, নিজের কানেই বেখাপ্পা লাগল শব্দগুলো। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। মনে হচ্ছে ফেটে বেরিয়ে আসবে।

'কি হলো, কিশোর?' অধৈর্য স্বরে জিজ্ঞেস করল চাচী।

আমাদের ওপর মাথাটা নামিয়ে নিয়ে এসেছে দানবটা। বিশাল হাঁ করে ফেলেছে মুখ। যেন গাড়িসহ আমাদের গিলে খেতে প্রস্তুত।

'আরি! দারুণ তো!' হঠাৎ হাসতে শুরু করল রবিন।

আমিও হাসা শুরু করলাম।

ওই মুহূর্তে আমিও বুঝে ফেললাম ব্যাপারটা। দানবটা জ্যান্ত নয়। বানানো। যান্ত্রিক। দানবীয় একটা বিলবোর্ড ডিসপ্লের অংশবিশেষ।

মাথা নিচু করে পাশের জানালা দিয়ে তাকালাম ভালমত দেখার জন্যে। ডিসপ্লেটার একেবারে পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়েছে চাচা। চাচা-চাচী দু'জনেই ম্যাপ নিয়ে এত ব্যস্ত, জিনিসটা চোখেই পড়েনি ওদের।

লাল-চোখো দানবটার দিকে তাকিয়ে আছি আমি। মাথা নামাল ওটা। চোয়াল ফাঁক করল। তারপর খটাস করে বন্ধ করে ফেলল আবার। ঝটকা দিয়ে ওপরে উঠে গেল মাথাটা।

'এত জ্যান্ত মনে হচ্ছে!' ওটার দিকে তাকিয়ে থেকে চিৎকার করে উঠল রবিন।

'হুঁ,' আমি বললাম। 'আমি তো প্রথমে জ্যান্তই ভেবেছিলাম। মনে হয়েছিল সানরুফ দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে টান দিয়ে তুলে নেবে আমাকে।'

পাশের জানালার কাঁচ নামিয়ে মাথা বের করে দিলাম। যান্ত্রিক

দানবটার গায়ে সাঁটানো বিলবোর্ড পড়লাম। বড় বড় অক্ষরে লেখা ইংরেজি বাক্যটার মানে করলে দাঁড়ায়: **মনস্টারল্যান্ডে স্বাগতম! এখানে জেগে জেগেই দুঃস্বপ্নের স্বাদ পাওয়া যায়।**

দুঃস্বপ্নের স্বাদ! কি অদ্ভুত কথা!

ওপর দিকে বাঁ কোনায় লাল রঙের তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো রয়েছে কোনদিকে যেতে হবে। পাশে লেখা: **এক মাইল।**

'ওখানে যাচ্ছি নাকি আমরা?' মুসা জিজ্ঞেস করল। যেতে ইচ্ছেও করছে তার, আবার ভয়ও পাচ্ছে। দানবটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগল সে।

'অদ্ভুত! ভয়ঙ্কর!' আনমনে বিড়বিড় করল রবিন।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঠাস করে গ্লাভ কম্পার্টমেন্টের দরজাটা লাগিয়ে দিল চাচা। ম্যাপ খুঁজে পাওয়ার আশা বাদ দিয়েছে। মুসার দিকে তাকাল, 'কি যেন জিজ্ঞেস করলে?'

'মনস্টারল্যান্ডে যাচ্ছি নাকি আমরা?'

'মনস্টারল্যান্ড? কিসের মনস্টারল্যান্ড?' বুঝতে পারল না চাচী।

'নামই তো শুনিনি,' চাচা বলল।

'এখান থেকে মাত্র মাইলখানেক হবে,' আমি বললাম। 'নাম শুনেই যেতে ইচ্ছে করছে।'

আবার গাড়ির ওপর মাথা নামিয়ে আনল দানবটা। সানরূফের ভেতর দিয়ে তাকাল। তারপর আবার মাথা তুলল। একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর তোলে আর নামায়। ওভাবেই সেট করে দেয়া আছে মেকানিজম।

'উঁহু,' বিলবোর্ডটা এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে চাচী, 'ওসব আজেবাজে জায়গায় যাওয়ার দরকার নেই। জু গার্ডেন তারচেয়ে অনেক ভাল হবে। মনস্টারল্যান্ড নামটাই আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'আমি কিন্তু যাওয়ার পক্ষেই বলব,' আমি বললাম।

রবিন বলল, 'আমিও।'

মুসা বলল, 'আমার ভয় লাগছে। আবার দেখতেও ইচ্ছে করছে।'

'জু গার্ডেন আর খুঁজে পাব না আমরা,' চাচাকে বললাম। 'তারচেয়ে চলো মনস্টারল্যান্ডেই চলে যাই। একটা সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা হবে মনে হচ্ছে আমার।'

নিচের ঠোঁট কামড়াল চাচী। দ্বিধা করতে লাগল। তারপর বলল, 'কি অভিজ্ঞতা হবে জানি না। তবে এ ধরনের জায়গাগুলো শুনেছি ভাল না।'

'এমন করে বলছ, যেন ভূতের আছর আছে?'

'ওসব কিছু না। তবে অপরিচিত জায়গা…কোথাও তো কখনও এ জায়গাটার বিজ্ঞাপনও চোখে পড়েছে বলে মনে পড়ে না।'

'ভাল না লাগলে চলে আসব। বাস তো আর করতে যাচ্ছি না।'

'চলুন আঙ্কেল, যাওয়াই যাক,' মুসা বলল।

'মজা হবে,' তার সঙ্গে সুর মেলাল রবিন।

চোয়াল ডলল চাচা। ভাবছে। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল আবার। 'হুঁ। এখানে বসে বসে অকারণ তর্ক করার চেয়ে কোথাও একখানে চলে যাওয়াটাই ভাল।'

প্রায় একসঙ্গে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমরা তিন বন্ধু। মনস্টারল্যান্ড জায়গাটা কেমন হবে তা নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম।

আমি বললাম, ভয় জাগানো ওসব 'রাইড'গুলো আমার খুব ভাল লাগে। চড়াচড়িগুলোতে যদি বিপদই না থাকল, মজাটা কোথায়।

'কিন্তু সেগুলো যদি ওই দানবটার মত ভয়ঙ্কর হয়,' আঙুল তুলে দেখাল রবিন, 'তাহলেই গেছি।'

'হ্যাঁ, সত্যি সত্যি ভয়ের ব্যাপার হবে তাহলে।' আমার দিকে তাকাল মুসা। 'তখন কি হবে?'

'আরে শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ,' অভয় দিলাম। 'পার্ক পার্কই। ভয়াল হলেই বা কি? সবই তো যান্ত্রিক ব্যাপার।'

কিন্তু তখনও জানতাম না, কতখানি ভুল কথা বলেছি আমি!

*

'এ রকম নির্জন বুনো জায়গায় এমন একটা থিম পার্ক বানিয়ে বসে থাকবে কেউ, ভাবাই যায় না,' চাচা বলল।

সীমাহীন এক গহন অরণ্যের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি আমরা। রাস্তার দুই ধারে বহু পুরানো বড় বড় গাছ। এত ঘন, রোদের আলোও ঢুকতে পারছে না ঠিকমত।

বনের নমুনা দেখে একটু আগে বলা চাচীর কথাটা মনে পড়ে গেল—এ ধরনের জায়গাগুলো শুনেছি ভাল না! খোদা, তার কথা যেন ভুল হয়।

আচমকা তীক্ষ্ণ মোড় নিল পথ। মোড়ের অন্যপাশে আসতেই সামনে পার্কের বিশাল গেটগুলো চোখে পড়ল।

লালচে রঙের উঁচু বেড়ার ওপাশে মাইলের পর মাইল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে পার্কটা। উত্তেজনায় পিঠ খাড়া হয়ে গেল আমার। সোজা হয়ে বসে তাকিয়ে রইলাম। বিচিত্র রঙ করা সব রাইড আর বিল্ডিঙের রঙিন চূড়াগুলো চোখে পড়ছে। মস্ত পার্কিং লট ধরে এগোনোর সময় গা ছমছমে অদ্ভুত অর্গানের বাজনা যেন গ্রাস করে নিল গাড়িটাকে।

'সাংঘাতিক কিন্তু! সত্যিই দারুণ!' মুসা বলল।

ওর সঙ্গে একমত আমি আর রবিন। গাড়ি থেকে নেমে সব দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম।

'একেবারেই তো খালি দেখা যাচ্ছে। গাড়িই নেই,' অস্বস্তি ভরা চোখে চাচীর দিকে তাকাল চাচা।

আবার না মত বদলে ফেলে এ জন্যে তাড়াতাড়ি বললাম, 'ভিড় নেই, ভালই তো। টিকেটের জন্যে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না।'

'অতিরিক্ত আগ্রহ দেখা যাচ্ছে তোর,' আমার দিকে তাকিয়ে হাসল চাচী।

'জায়গাটাই তো আগ্রহ জাগানোর মত,' জবাব দিলাম।

আমার মতই রবিন আর মুসাও আগ্রহ নিয়ে দেখছে আশপাশটা।

চওড়া পার্কিং লটটা পেরোলাম আমরা। গেটের কাছে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়ানো। লটের শেষ মাথায় এক সারি বাস। সবুজ আর গোলাপী রঙ করা। গায়ে লেখা মনস্টারল্যান্ডের নাম।

ওগুলোর কাছাকাছি গিয়ে থামল আমাদের গাড়ি। সামনের গেটটাকে ভালমত দেখার সুযোগ পেলাম। বিলবোর্ডওয়ালা যে দানবটাকে দেখেছিলাম, অবিকল ওরকম একটা দানব দাঁড়িয়ে আছে মস্ত একটা গোলাপী-সবুজ সাইন লাগানো গেটের ওপাশে। সাইনবোর্ডে লেখা ইংরেজি বাক্যটার মানে করলে দাঁড়ায়: **দানবনগরের দানবেরা দানবনগরে স্বাগত জানাচ্ছে তোমাদের।**

'মাথামুণ্ড তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' সাইনটার দিকে তাকিয়ে বলল চাচী। 'দানবনগরের দানব বলে কি বোঝাতে চাইছে ওরা?'

'সেসব জানতেই তো এলাম,' উৎসাহের সঙ্গে বললাম আমি।

অর্গানের শব্দ ভারী করে রেখেছে পার্কিং লটের বাতাস। গেটের ডানপাশের খালি জায়গা দেখে গাড়ি রাখল চাচা।

গাড়িটা থেমেও সারতে পারল না, দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে পড়লাম আমি। চিৎকার করে মুসা আর রবিনকে ডাকতে লাগলাম, 'নামো, নামো!'

ওরা নামতেই গেটের দিকে ছুটতে শুরু করলাম আমরা। আমার চোখ গেটের ওপাশে দাঁড়ানো দানবটার দিকে। বিলবোর্ড দানবটার মত মাথা নামাচ্ছে না এটা, স্থির হয়ে আছে। জ্যান্ত মনে হচ্ছে এটাকে।

ফিরে তাকালাম। চাচা-চাচীও দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে। 'দারুণ জায়গা! দারুণ!' চিৎকার করে বলতে গেলাম।

ঠিক ওই মুহূর্তে বিকট এক বিস্ফোরণের শব্দে মাটি কেঁপে উঠল।

আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমাদের গাড়িটার দিকে। টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে ওটা।

তিন

আমার চিৎকার থামতে বহু সময় লাগল। ঢোক গিললাম। হয়ে গেলাম শব্দহীন। যেন পাথর।

সবাই স্তব্ধ হয়ে গেছি আমরা। দোমড়ানো-কুঁচকানো ধাতু আর অন্যান্য জিনিসের পোড়া টুকরো ফুলঝুরির মত ছিটকে গেল চতুর্দিকে।

'কি করে…?' কোনমতে শব্দ দুটো বেরোল চাচার মুখ থেকে।
'আমার…আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!' আমি বললাম।
'ভাগ্যিস সবাই আমরা গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম,' বিড়বিড় করল চাচী। মুরগী যে ভাবে ছানা আগলায়, তেমনি করে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল আমাদেরকে। 'তোরা যে সব ভাল আছিস, সেটাই আমার কপাল!'
এখনও স্তব্ধ হয়ে আছে মুসা আর রবিন। টুঁ শব্দ করছে না। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে গাড়িটা যেখানে ছিল সেদিকে।
'আমার গাড়ি!' ফিসফিস করে বলল চাচা। 'আ-আমার…কিন্তু কি ভাবে…কি ভাবে ঘটল!'
'বেঁচে যে গেছি,' বিড়বিড় করল চাচী, 'এটাই আসল কথা। কি ভয়ানক শব্দ। কানে লেগে রয়েছে। সরাতে পারছি না।'
'আমি…পুলিশ ডাকতে যাচ্ছি,' চাচা বলল। আনমনে বিড়বিড় করে, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে গেটের দিকে রওনা হলো সে।
তার দিকে দৌড়ে গেল চাচী। 'কিন্তু গাড়িটা এ রকম বিস্ফোরিত হলো কিভাবে কিছু বুঝতে পারছ? কিসের কারণে এমন হলো, সেটা তো জানা দরকার।'
'কি ভাবে জানব?' রেগে উঠল চাচা। 'আমি…আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কি করব এখন কে জানে!'
ভয় পেয়ে গেছে চাচা। তাকে দোষ দেয়া যায় না। বিস্ফোরণটা ছিল সত্যিই ভয়ঙ্কর।
বিস্ফোরিত হওয়ার সময় গাড়িতে থাকলে কি হতো কল্পনা করে শীতল শিহরণ বয়ে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে।
'গাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে নাকি আশপাশে কোথাও?' জিজ্ঞেস করল চাচী।
এ সব জরুরী প্রয়োজনের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে চাচীর।
প্রবেশমুখের কাছে টিকেট বুথের দিকে এগিয়ে গেল চাচা। বুথের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটা সবুজ দানব। বড় বড় হলুদ চোখ তার, মাথায় বাঁকা কালো শিং। দারুণ একটা সাজ নিয়েছে, মনে হলো আমার। পোশাকটা মানিয়েছে ভাল। গায়ের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গেছে মনে হয় সত্যিকারের দানব।
'মনস্টারল্যান্ডে স্বাগতম,' নিচু স্বরে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল সে। আচমকা জোরাল বাজনার শব্দ যেন লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল টিকেট বুথের ভেতর থেকে। 'আমি একজন মনস্টারল্যান্ডের মনস্টার। আশা করি চমৎকার একটা ভয়াল দিন শুরু হয়েছে আপনাদের।'
'কিন্তু আমার গাড়ি!' অধৈর্য হয়ে চিৎকার করে উঠল চাচা। 'গাড়ির কি হবে? বিস্ফোরিত হয়ে গেছে। ফোন করা দরকার। ফোনটা কোথায়?'
'সরি, স্যার,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল দানবের পোশাক পরা লোকটা।

'ফোন নেই।'

'বলেন কি?' মুখ কালো হয়ে গেল চাচার। ঘামে চকচক করছে কপাল। 'কিন্তু একটা ফোন যে আমার খুবই দরকার। এক্ষুনি!' রাগত চোখে দানবটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল চাচা। 'আমার গাড়িটা বিস্ফোরিত হয়ে গেছে। এখানে আটকা পড়েছি আমরা।'

'এখানে আপনাদের দায়দায়িত্ব সব আমাদের, আমরাই আপনাদের দেখব,' ঘোঁৎ-ঘোঁতের সঙ্গে ফিসফিসানি মেশানো এক অদ্ভুত স্বরে জবাব দিল দানবটা।

'দেখাদেখি তো পরের কথা!' চিৎকার করে উঠল চাচা। 'আমাদের একটা গাড়ি দরকার। একটা ফোন করা অতি জরুরী। বুঝতে পারছেন আমার কথা?'

'ফোন নেই,' জবাব দিল দানব। 'কিন্তু স্যার, আপনি শান্ত হোন তো। আমরা আপনাদের দেখব। আপনাকে কথা দিচ্ছি আপনাদের ভালমন্দ সব দেখা হবে এখানে। অযথা ভেবে ভেবে মনস্টারল্যান্ডে আসার আনন্দটা মাটি করবেন না।'

'আনন্দ মাটি?' রাগ চড়ে গেল চাচার। 'মাটি হওয়ার আর বাকি থাকল কি? গাড়িটা গেছে...'

এত প্রচণ্ড শব্দে আবার অরগানের শব্দ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাইরে, চমকে গেলাম। শব্দটা হরর মুভিতে বাজানো শব্দের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

'বললাম তো এখন থেকে আপনাদের সব দায়দায়িত্ব আমাদের,' একই স্বরে জবাব দিল দানবটা। 'কিচ্ছু ভাববেন না।' বিচিত্র একটা হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। জ্বলজ্বল করে উঠল হলুদ চোখ। 'বরং আনন্দটা উপভোগ করুন। কি ভাবে বাড়ি যাবেন সেটা নিয়ে ভাবার দরকার নেই। আপনাদের দায়িত্ব এখন আমাদের।'

'কিন্তু...কিন্তু...' কোনমতেই অস্বস্তি যাচ্ছে না চাচার।

পার্কের দিকে হাত তুলল দানবটা। 'প্লীজ, সব দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়ে এখানে আমাদের মেহমান হয়ে যান। ফ্রী অ্যাডমিশন। টিকেট লাগবে না। টাকা-পয়সা কিছু লাগবে না। আপনার গাড়িটার জন্যে সত্যিই দুঃখিত। তবে আবারও বলছি, গাড়ির জন্যে ভাবা লাগবে না আপনার।'

আমাদের দিকে ফিরে তাকাল চাচা। কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ছে। দানব-লোকটা যতই বোঝাক দুশ্চিন্তা আর অস্বস্তি যাচ্ছে না তার। 'আমি...আমি কোনমতেই পার্কের আনন্দ আর ভোগ করতে পারব না এখন। কল্পনাই করতে পারিনি এ রকম কিছু ঘটে যাবে। সত্যি পারিনি! এখন কোনমতে একটা গাড়ি জোগাড় করতে পারলে বাঁচি...যে কোন ভাবেই হোক...'

'চাচা,' আমি বললাম, 'যা হবার তো হয়েই গেছে। চিন্তা করলে তো আর ফেরত আসবে না গাড়িটা। তারচেয়ে ঢুকেই যখন পড়া গেছে, পার্কটা

দেখে যাই।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ!' মুসা বলল।

রবিন বলল, 'ঠিক!'

'এতখানি পথ গাড়িতে বসে থাকতে থাকতে আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীর,' চাচীও আমাদের পক্ষে বলল। 'চলো না, একটু ঘোরাঘুরি করেই আসি। ছেলেগুলোও দম ফেলে বাঁচুক।'

ভাবতে লাগল চাচা। তীব্র ভ্রূকুটিতে কুঁচকে গেল চোখের চারপাশ। অবশেষে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বেশ, চলো, যাই।'

গেটের এপাশে আসতে অরগানের শব্দ আরও জোরাল হয়ে আমাদের কানে বাজতে থাকল।

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'দেখো দেখো, কাণ্ড দেখো! একেবারে হরর মুভির দৃশ্য!'

বাদামী রঙের পুরানো একটা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমরা। রাস্তার জায়গায় জায়গায় ভেঙে আস্তর উঠে গিয়েছিল, মেরামত করা হয়েছে–দেখতে লাগছে ঘা শুকানো ক্ষতের মত। রাস্তার দুই ধারে বহু পুরানো অদ্ভুত সব কটেজ যেন কোনমতে টিকে রয়েছে। বড় বড় গাছ সূর্যের আলো প্রায় ঢেকে দিয়েছে। বাতাসে শীত শীত ভাব।

কটেজগুলোর দিক থেকে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসছে ক্ষুধার্ত নেকড়ের ডাক।

'ভয়ানক জায়গা!' ফিসফিস করে রবিন বলল। জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে।

একটা সাইনবোর্ড দেখা গেল। তাতে লেখা: **মায়ানেকড়ের গাঁয়ে স্বাগতম। দয়া করে মায়ানেকড়েদের খাবার দেবেন না। নিজেরাও ওদের খাবার হয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন।**

নেকড়ের ডাক জোরাল হতে লাগল।

সাইনবোর্ডটার দিকে তাকিয়ে হাসলাম আমি আর রবিন।

সরু রাস্তার ধারের একটা কটেজের অন্ধকার জানালা দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম একটা সবুজ-দানবকে। আরেকটা দানব আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। হাতে একটা মানুষের খুলি। সেটা দিয়ে লোফালুফি খেলতে খেলতে গেল।

'খাইছে!' এতক্ষণে ভয় পেতে আরম্ভ করেছে মুসা।

ক্ষতবিক্ষত রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম আমরা। কটেজের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল আমাদের জুতোর শব্দ।

আচমকা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম তিনজনে। একটা নেকড়েবাঘ দৌড়ে চলে গেল আমাদের সামনে দিয়ে। ভালমত দেখার আগেই একটা কটেজের আড়ালে চলে গেল।

'সত্যিকারের নেকড়ে নাকি?' গলা কাঁপছে রবিনের।

'আরে নাহ্,' আমি বললাম। 'বড় জাতের কুকুর-টুকুর হবে। রাস্তায় দেখে আসা দৈত্যটার মত যান্ত্রিক নেকড়ে হলেও অবাক হব না।'

'আর যাই হোক,' প্রসঙ্গটা থেকে সরে যাবার জন্যেই যেন চাচী বলল, 'পার্কটাকে পরিষ্কার রাখে ওরা। একেবারে ঝকঝকে। কোথাও একটা কুটো পড়ে নেই। আর মানুষজন তো একেবারে নেই। হই-চই থেকে বাঁচা গেল।'

পেছন পেছন আসছে চাচা। কোন কিছুতে মনোযোগ দিতে পারছে না। বলল, 'একটা ফোন দরকার। বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থাটা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত কোন কিছুতেই মজা পাব না আমি।'

'কিন্তু...' বলতে গেল চাচী।

থামিয়ে দিল চাচা, 'কোথাও না কোথাও ফোন তো একটা নিশ্চয় আছে। এতবড় একটা প্রতিষ্ঠান ফোন ছাড়া চলে এ কথা কে বিশ্বাস করবে। তোমরা এগোও। আমি দেখে আসি।'

'না, আমিও তোমার সঙ্গে আসছি,' চাচী বলল। 'তোমার মনের অবস্থা ভাল না। কোথায় কি অঘটন ঘটিয়ে বসবে তুমি কে জানে। আমাদেরকে ছাড়াই ওরা পার্ক দেখতে পারবে। আমরা থাকলে বরং ওদের আনন্দটা মাটি হবে।'

'একা ছেড়ে দেবে?' চাচা রাজি হতে পারছে না। 'একা একা ছেড়ে দেবে এ রকম একটা জায়গায়?'

'অসুবিধে কি?' দ্রুত চাচার দিকে এগিয়ে গেল চাচী। 'খুব ভাল থাকবে ওরা। জায়গাটা তো আমার পছন্দই হয়েছে। কি আর হবে ওদের, ওরা একা একা ঘুরলে?'

একা ঘুরলে কি যে হবে সেটা চাচী যদি জানত তখন।

টেলিফোন সেট খুঁজতে তাড়াহুড়া করে রওনা হয়ে গেল দু'জনে।

যেতে যেতে ফিরে তাকাল চাচী। আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'দেখা শেষ করে এখানেই ফিরে আসিস। আমরাও যেখানেই যাই, এখানে চলে আসব।'

হঠাৎ করে একা হয়ে গেলাম আমরা তিনজনে–আমি, মুসা আর রবিন।

এগোতে গিয়েও আবার ফিরে তাকালাম। চলে যাচ্ছে চাচা-চাচী।

আবার মুখ ফেরাতেই নেকড়েটাকে চোখে পড়ল। কটেজের আড়াল থেকে মুখ বের করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই ঝাঁকি দিয়ে মাথা নামিয়ে আবার উঁচু করে তাকাল। চাপা গর্জন করে যেন হুঁশিয়ার করল আমাদের।

বরফের মত জমে গেছি তিনজনে। তাকিয়ে আছি ভয়ঙ্কর প্রাণীটার লাল টকটকে ক্ষুধার্ত চোখের দিকে।

চার

চিৎকার দিয়ে দু'দিক থেকে রবিন আর মুসার হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে সরে গেলাম।

সাপের মত পিচ্ছিল গতিতে এগিয়ে এল নেকড়েটা। মাথাটা সামনে বাড়িয়ে সাপের মতই লম্বা করে রাখল। চোখ দুটো রাগে লাল। ক্ষুধার্ত মুখটা হাঁ হয়ে আছে।

'জ্যা-জ্যা-জ্যান্ত প্রাণী!' তুতলে বলল মুসা। 'যান্ত্রিক নয়।'

ওর কাঁধে হাত রাখলাম। কাঁপছে সে।

চাপা আরেকটা গর্জন ছাড়ল নেকড়েটা।

তারপর ফিরে গিয়ে দাঁড়াল আবার কটেজের পাশে। আড়ালে চলে গেল।

'আমার কেন জানি জ্যান্ত মনে হচ্ছে না ওটাকে,' আমি বললাম। 'রোবট-টোবট হবে।'

'রোবট হলেও একেবারে জ্যান্ত,' রবিন বলল। 'আসল নেকড়ের মতই এটাও মাংস খায় কিনা কে জানে!'

'চলো অন্য কোথাও চলে যাই,' মুসা বলল। 'এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না আমার।'

'ওদিকে ওই সাইনবোর্ডটা কিসের?' হাত তুলে দেখাল রবিন। জবাবের অপেক্ষা না করে ছুটতে শুরু করল সেদিকে। পাথরের রাস্তায় তার জুতোর শব্দ হতে লাগল ধুপধাপ করে। আমি আর মুসা তাকে অনুসরণ করলাম।

সাইনবোর্ডটাতে লেখা রয়েছেঃ **খবরদার! ভুলেও কখনও কেউ কাউকে চিমটি কাটবে না!**

আজব সাইনবোর্ড। মুসাকে বলল রবিন, 'তোমার ম্যাড পিঞ্চারগিরি এখানে বন্ধ রাখতে হবে।'

কিন্তু বন্ধ রাখল না মুসা। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে রবিনের বাহুতে চিমটি কেটে বসল। উহ্ করে উঠল রবিন।

পেছনে শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। একটা সবুজ দানবকে কটমট করে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম আমাদের দিকে।

একটা কটেজের ওপাশ থেকে বেরোতে দেখলাম একটা দানব-পরিবারকে। বাবা, মা আর ছোট্ট একটা মেয়ে। কোন কারণে কাঁদছে মেয়েটা। মা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। বাবাটা হাত রেখেছে কাঁধে। বেশ বিব্রত মনে হচ্ছে ওদেরকে।

বাতাস চিরে দিল এ সময় নেকড়ের চিৎকার।

'চলো চলো,' তাড়া দিল মুসা। 'এখানে দাঁড়িয়ে সারাদিন পার করে দেয়ার কোন মানে হয় না। রাইড-টাইডে চড়িগে।'

'নিশ্চয় সেই রাইডটাও হবে ভয়ঙ্কর,' রবিন বলল। 'চড়লে ভয় দেখিয়ে আত্মা কাঁপিয়ে দেবে।'

আলাদা হতে সাহস করলাম না। গায়ে গা ঠেকিয়ে মায়ানেকড়ের গাঁয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগলাম আমরা। ধীরে ধীরে চওড়া হতে লাগল রাস্তা। বড় একটা গোল চত্বরে এসে দাঁড়ালাম। গাছপালার আড়াল ছেড়ে বেরোতেই উজ্জ্বল রোদের আলো যেন ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল গায়ের ওপর।

চত্বরের চারপাশ ঘিরে রয়েছে অনেকগুলো গোলাপী-সবুজ রঙ করা বিল্ডিং। আরও কয়েকটা দানব-পরিবারকে দেখা গেল ওখানে। বেশ কয়েকটা সবুজ দানব ঘুরে বেড়াচ্ছে, নজর রাখছে সব কিছুর ওপর। গাট্টাগোট্টা একটা দানব গোলাপী-সবুজ একটা ঠেলাগাড়িতে করে কোন্ আইসক্রীম বিক্রি করছে। কালো রঙের আইসক্রীম।

মুখ বাঁকাল রবিন।

মুসার ভাবান্তর হলো না। লোভও দেখা গেল না তার মাঝে।

তাড়াতাড়ি গাড়িটার পাশ কাটিয়ে এলাম আমরা। পাশ কাটালাম আরেকটা 'চিমটি না কাটতে' সাবধান করে দেয়ার সাইনবোর্ড। তারপর উঁচু একটা গোলাপী বিল্ডিঙের সামনে এসে দাঁড়ালাম। চূড়াটা এমন করে বানানো, ছোটখাট একটা পাহাড় বললে ভুল হবে না।

'এটা একটা রাইড,' আমি বললাম।

বিল্ডিঙের পাশে একটা দরজা। দরজার কপালে লেখা: **নরকের দরজা। পিছলে নরকে যেতে চাইলে ঢুকে পড়ো এখানে।**

'বাপরে!' মুসা বলল। 'ভয় দেখানোর কত রকম কায়দা। কিন্তু পিছলে নরকে যাব কি ভাবে?'

'আমার মনে হয়, যেতে চাইলে প্রথমে এটার ওপরে উঠে যেতে হবে তোমাকে,' আঙুল তুলে চূড়াটা দেখালাম। 'তারপর পিছলে নামতে হবে যতদূর যাওয়া যায়।'

'চলো, চড়ে দেখি,' রবিন বলল। 'যা থাকে কপালে।'

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম তিনজনে। ভেতরটা অন্ধকার। ঠাণ্ডা। কাঠের সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে ওপরে। ওটা বেয়েই ওপরে যেতে হবে বুঝতে পারলাম।

বাচ্চাদের হই-চই আর হাসাহাসি কানে আসছে, কিন্তু দেখা গেল না কাউকে। একবার মনে হলো, স্পীকার লুকানো আছে। ক্যাসেটে বাজানো হচ্ছে ওই শব্দ। পরক্ষণে মনে হলো, দূর, তা করবে কেন? জবাব, পরিবেশের বাস্তব রূপ দেয়ার জন্যে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম তিনজনে।

অর্ধেক উঠে আরেকটা সাইনবোর্ড দেখলাম। লিখেছে: **সাবধান! হয়তো**

তোমারই জন্যে নরকের প্রবেশ পথে অপেক্ষা করছে শয়তান!

কি সব ছেলেমানুষী কথাবার্তা! এ সব বলে কি কাউকে ভয় দেখানো যায়। বাচ্চাদের চিৎকার বেড়ে যাচ্ছে। পিছলে নামার খেলায় মেতেছে যেন সবাই। অথচ দেখতে পাচ্ছি না কাউকে। শব্দটা আসছে অন্ধকার থেকে।

রবিন আর মুসাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি, ভয় লাগছে?'

'একেবারে লাগছে না, তা বলব না,' জবাব দিল রবিন। 'তবে আগেও দেখেছি এ ধরনের জিনিস।'

একটা দানবকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'স্লাইড রয়েছে এখানে, তাই না? কতদূর যাওয়া যায়?'

'বহুদূর!' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল দানব।

'স্লাইড পছন্দ করার ব্যাপারে সাবধান,' অন্য দানবটা বলল। 'ডুম স্লাইডে যদি বসে পড়ো, শেষ। কোনওদিন আর বেঁচে ফিরতে পারবে না।' স্লাইডগুলোর সামনের নম্বর দেখাল সে। কালো রঙে লেখা নম্বরগুলো।

'হ্যাঁ, ডুম স্লাইডে বোসো না, যদি মরতে না চাও,' সুর মেলাল তার সঙ্গী। 'পিছলাতেই থাকবে। পিছলাতেই থাকবে। সারা জীবন শুধু পিছলেই যাবে, শেষ আর হবে না।'

হেসে উঠলাম।

সন্দেহ হলো, ওরা আমাদেরকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু মনটা খচখচ করতেই থাকল। সত্যি কি ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে?

পাঁচ

তিন নম্বরটা বেছে নিলাম। কারণ কিছুদিন থেকে ওটা আমার লাকি নাম্বার। মুসা বসল আমার পাশে, দুই নম্বরটায়। কিন্তু রবিনের কি মনে হলো কে জানে, সে চলে গেল দূরে, একেবারে শেষে, দশ নম্বরে। যাক। যার যেটা পছন্দ।

দানবরা কি করছে দেখার জন্যে ফিরে তাকালাম। কিন্তু ভাল করে দেখার আগেই নিচের দিকটা দুলে উঠল। কাত হয়ে গেল স্লাইডের বোর্ড।

পিছলে পড়তে শুরু করলাম। নিজের অজান্তেই বেরিয়ে গেল গলা চিরে তীক্ষ্ণ চিৎকার।

ঝটকা দিয়ে দুই হাত উঠে গেল মাথার ওপর। সামনে ঝুঁকে গেলাম। যতক্ষণ নামলাম, প্রায় ততক্ষণই চিৎকার করলাম। বিশাল ডুম স্লাইড বিল্ডিঙের ভেতরের মস্ত অন্ধকার উপত্যকাটায় প্রতিধ্বনি তুলল আমার চিৎকার।

তবে রাইডটা দারুণ একথা স্বীকার করতেই হবে। বাঁকের পর বাঁক।

এদিকে মোড় নিয়ে, ওদিক দিয়ে ঘুরে নেমেই চলেছি, নেমেই চলেছি। যত নামছি, গতি বাড়ছে। কোথায় গিয়ে ঠেকব, কিসের সঙ্গে ধাক্কা খাব, জানি না। অন্ধকারে এ এক অন্য রকম অনুভূতি।

ছায়া ঢাকা অতি আবছা আলোতে মাঝে মাঝে মুসাকে চোখে পড়ছে। প্রায় চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে। মুখটা ফাঁক। ওপর দিকে চোখ।

আরেকবার কাছাকাছি হতেই চিৎকার করে ওকে ডাকতে গেলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঁক নিয়ে আরেক দিকে ঘুরে দূরে সরে গেল তার স্লাইড।

নামছি। নামছি।

নামছি, উঠছি, বাঁক নিচ্ছি–অদ্ভুত এক মানব-নাগরদোলার মত। অনুভূতিটা বলে বোঝাতে পারব না।

নামা। নামা। শুধুই নামা। উঠছি না আর। অন্ধকার। অন্ধকার।

আলোর গতির চেয়ে জোরে নামছি বলে মনে হতে লাগল আমার।

নিজেকে সামলাতে পারছি না, এরই মাঝে একবার এপাশে একবার ওপাশে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করছি মুসা আর রবিনের কি অবস্থা। কিন্তু অন্ধকার আর গতির কারণে কোন কিছুর ওপরই স্থির করতে পারছি না নজর।

দ্রুত। অতি দ্রুত।

এবং, তারপর, ধড়াম!

একটা মুখ খুলে গেল। কিংবা শেষ হয়ে গেল স্লাইডিং বোর্ড। উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়লাম। প্রচণ্ড জোরে। বসা অবস্থায়।

আবার ধড়াম!

আমার ঠিক পাশেই এসে পড়ল মুসা। যে ভাবে আধশোয়া হয়ে ছিল স্লাইডিং বোর্ডে, ঠিক সেই অবস্থায়। ওঠার চেষ্টা করল না। আমার দিকে তাকিয়ে চওড়া হাসি হাসল। 'কোথায় এলাম?'

'মাটিতে,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম। হাত দিয়ে প্যান্টের পেছনে লাগা ধুলো ঝাড়লাম। 'দারুণ একটা রাইড, তাই না?'

'দারুণ! দারুণ! চলো আবার চড়িগে,' মাটিতে আধশোয়া হয়ে পড়ে থেকে বলল সে।

'কিন্তু যাব কি করে, তুমি না উঠলে?' হাসতে হাসতে বললাম।

'তোলো,' হাত বাড়িয়ে দিল সাহায্য করার জন্যে। 'উঠতে পারছি না।'

হাত ধরে টান দিলাম। যথেষ্ট ভারী সে। গুঙিয়ে উঠলাম। টেনে তুলে সোজা করে বসালাম। অধৈর্য হয়ে বললাম, 'অনেক হয়েছে। নাও, নিজে নিজেই ওঠো এখন।'

'ভয় নাকি পাও না তুমি?' হেসে বলল সে। 'অন্ধকারে সমানে চিৎকার করে যাচ্ছিলে।'

'ইচ্ছে করেই করেছি,' সত্যি কথাটা বলতে লজ্জা লাগল। 'চিৎকার করতে ইচ্ছে করছিল।'

'হ্যাঁ, বটেই তো,' আমার কথা বিশ্বাস করল না মুসা। উঠে দাঁড়াল অবশেষে। 'উফ্! মাথাটা কেমন করছে। ঘোলা ঘোলা লাগছে। আচ্ছা, কত জোরে ছুটছিলাম, অনুমান করতে পারবে?'

কাঁধ ঝাঁকালাম। 'অনেক অনেক জোরে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, গতি অনুমান করা কঠিন।'

এই সময় মনে পড়ল রবিনের কথা। ওকে দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের সঙ্গে স্লাইড থেকে নামেনি সে। ফিরে তাকালাম। স্লাইড থেকে বেরোনোর মুখগুলো সব বন্ধ।

'রবিন কোথায়?'

এতক্ষণে মুসারও মনে পড়ল রবিনের কথা। 'তাই তো!'

মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা। রবিনের বেরোনোর অপেক্ষা করতে লাগলাম। যে কোন মুহূর্তে মুখ খুলে গিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসবে সে।

অস্থির হয়ে উঠল মুসা। তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'কোথায় ও? বেরোয় না কেন? গতি কি আমাদের স্লাইডগুলোর চেয়ে কম?'

মাথা নাড়লাম। অস্বস্তি লাগছে। পেটের ভেতরে খামচে ধরার অনুভূতি। হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে।

'রবিন, বেরোও!' ডাক দিলাম মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে। 'বেরোচ্ছ না কেন?'

মাথা চুলকাল মুসা। 'ঘটনাটা কি? কোথায় গেল ও? বেরোচ্ছে না কেন বলো তো?'

'সামনের দিক দিয়ে কিংবা অন্য কোনখান দিয়ে বেরিয়ে যায়নি তো?' আমি বললাম। 'হয়তো দশ নম্বর স্লাইডের মুখ অন্যদিকে। চলো, ঘুরে দেখি।'

বিল্ডিংটার সামনের দিকে এগোনোর সময় মনে মনে নিজেকে চাবকাতে থাকলাম এত সহজে ভয় পেয়ে গেছি বলে। নিশ্চয় অন্য কোন মুখ দিয়ে বেরিয়েছে রবিন। হয়তো এখন বিল্ডিঙের সামনে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। আমাদের মতই উদ্বিগ্ন।

বাড়ির পাশ ঘুরে আসতেই চোখে পড়ল গোল চত্বরটা। রবিনকে খুঁজতে লাগল আমার চোখ। একই সঙ্গে চাচা-চাচীকেও। চত্বরের অন্যপাশে দুটো দানব-পরিবারকে দেখতে পেলাম। সেই আইসক্রীমওয়ালাও আছে তার জায়গায়।

রবিনের দেখা নেই।

ছুটতে ছুটতে ডুম স্লাইডের প্রবেশপথের কাছে চলে এলাম আমি আর মুসা। কালো প্রবেশমুখটার কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে গেলাম।

'এখানেও তো নেই!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা।

আমিও হাঁপাচ্ছি। পেটের মধ্যে ফিরে এসেছে খামচি দিয়ে ধরার মত

অনুভূতিটা।

'কি করব এখন?' মুসার চোখে ভয়।

প্রবেশপথের ঠিক মুখের কাছে ভেতরের দিকে দাঁড়িয়ে আছে একজন মহিলা-দানব। দৌড়ে গিয়ে তার কাছে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, একটা ছেলেকে এদিক দিয়ে বেরোতে দেখেছেন?'

দানবের হলুদ চোখ জোড়াতে আলো ঝিলিক দিতে দেখলাম। জবাব দিল, 'না তো। এটা ঢোকার পথ, এখান দিয়ে বেরোনো যায় না।'

'তার চোখে চশমা আছে,' আমি বললাম। 'গায়ে নীল রঙের শার্ট...'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল মহিলা। 'এদিক দিয়ে কেউ আসেনি। পেছনে গিয়ে খুঁজে দেখতে পারো। ওদিক দিয়েই সবাই বেরোয়।'

'না, বেরোয়নি,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল মুসা। 'ওখান থেকেই তো এলাম।' জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে তার। আতঙ্ক চাপা দিতে পারছে না।

ভয় আমিও পেয়েছি। মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছি। এ সব মুহূর্তে শান্ত থাকাটা অতি জরুরী।

'পেছন দিক দিয়ে বেরোয়নি সে,' মহিলাকে বললাম। 'আর সামনে দিয়ে তো বেরোয়ইনি, আপনিই বললেন। তাহলে হলোটা কি তার?'

একটা মুহূর্ত চুপ করে থাকল মহিলা। তারপর নিচু স্বরে ফিসফিস করে বলল, 'হতে পারে, ডুম স্লাইডে চড়ে বসেছিল তোমাদের বন্ধু!'

ছয়

দানবের পোশাক পরা মহিলার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। 'আপনি...আপনি মজা করছেন, তাই না?...আমি বলতে চাইছি ওই ডুম স্লাইডের কথা...রসিকতা করছেন?'

রাগল না মহিলা। তবে বড় বড় হলুদ চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। জবাব দিতে দেরি করল। 'কেন, সাইনবোর্ডে তো সাবধান করে দেয়া হয়েছে। পড়োনি? যে কোন রাইডে চড়তে যাবার আগেই সবাইকে সাবধান করে দেয়া হয়।'

তারপর আর কিছু না বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল সে। হারিয়ে গেল অন্ধকারে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি আর মুসা। আমার গলা শুকিয়ে গেছে। হাতের তালু বরফের মত শীতল।

'ছাগল পেল নাকি আমাদের?' রেগে গেছে মুসা। দুই হাত ঠেলে ঢোকাল প্যান্টের পকেটে। 'ডুম স্লাইড না ইডিয়ট স্লাইড। আমাদেরকে এ ভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে কেন ওরা?'

'হতে পারে এটাই ওর কাজ,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিলাম। 'হয়তো এ কাজের জন্যেই বেতন দিয়ে রাখা হয়েছে ওকে।'

'আঙ্কেল আর আন্টিকে এখন খুঁজে বের করা দরকার,' শুকনো কণ্ঠে বলল মুসা।

'ওদের নিয়ে ভাবতে হবে না। ওরা বহাল তবিয়তেই আছে। আগে বরং রবিনকে খুঁজে বের করা দরকার। ওকে ফেলে গেছি দেখলে রেগে যাবে চাচা-চাচী। গাড়ি হারিয়ে চাচার এখন মেজাজ খারাপ। কোন ছুতোনাতা পেলেই ধরে নিয়ে সোজা বাড়ি রওনা হবে।'

'রবিনকে এখন পাই কোথায় বলো তো?' বিষণ্ন ভঙ্গিতে বলল মুসা।

চত্বরের দিকে ফিরে তাকালাম। চাচা-চাচী অনুপস্থিত। দুটো ছেলে আইসক্রীম কিনে খাচ্ছে। বড় ঝাড়ু দিয়ে দুজন দানব চত্বর ঝাড়ু দিচ্ছে।

দূরে মায়ানেকড়ের গাঁয়ের দিক থেকে ভেসে এল নেকড়ের ডাক।

সূর্য চড়েছে। মাথা আর কাঁধে লাগছে কড়া রোদ। তারপরেও শীত যাচ্ছে না আমার।

'রবিন, কোথায় তুমি?' জোরে জোরে মনের ভাবনাটাই মুখে প্রকাশ করলাম।

'নিশ্চয় ডুম স্লাইডে পিছলে মরছে এখন সে,' মুসা বলল। 'মৃত্যুর আগে আর এ পিছলানো বন্ধ হবে না তার।'

'বোকার মত কথা বোলো না। ওসব আজগুবী কথা কে বিশ্বাস করে?' তবে মুসার কথায় একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। ওর হাত ধরে টানলাম, 'এসো আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'আবার গিয়ে স্লাইডে চড়ব।'

'খাইছে!' হাঁ হয়ে গেল মুসার মুখ। 'বলো কি? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার? এদিকে রবিনের খোঁজ নেই। আমরা যাব আবার স্লাইডে চড়ে মজা করতে?'

'উঁহু, মজা করতে যাচ্ছি না,' মাথা নাড়লাম। 'যাচ্ছি রবিনকে খুঁজতে।'

মুসার হাত ধরে টেনে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকার প্রবেশ পথটাতে ঢুকে পড়লাম আবার।

'তুমি, সত্যিই…?' বলতে গিয়ে কি ভেবে থেমে গেল মুসা। সম্ভবত আমার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছে।

মাথা ঝাঁকালাম। 'হ্যাঁ, সত্যিই। কি করব জানো? ওকে অনুসরণ করব। ও যে স্লাইডটায় চড়েছিল, আমরাও সেটাতে চড়ব।'

'স্লাইড নম্বর টেন,' বিড়বিড় করল মুসা। তারপর কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ডুম স্লাইড!'

'হ্যাঁ, ওটাতেই চড়ব আমরা,' জোর দিয়ে বললাম। 'আর ওটাই আমাদেরকে নিয়ে যাবে রবিনের কাছে।'

নীরবে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। ফাঁপা, বিশাল বাড়িটার মধ্যে আমাদের জুতোর শব্দ অনেক জোরাল হয়ে কানে বাজতে থাকল।

প্রায় দৌড়ে উঠে এলাম অর্ধেক-সিঁড়ি যেখানে সাইনবোর্ড লেখা রয়েছে–সাবধান! হয়তো তোমারই জন্যে নরকের প্রবেশ পথে অপেক্ষা করছে শয়তান!

রবিন কি এখনও পিছলেই বেড়াচ্ছে?–অবাক হয়ে ভাবলাম।

জোরে জোরে মাথা নেড়ে ভাবনাটা মগজ থেকে দূর করে দিতে চাইলাম। অসম্ভব! এখন পর্যন্ত স্লাইডিং করে বেড়াতেই পারে না। ভাবনাটার কোন যুক্তিই নেই।

স্লাইডের প্ল্যাটফর্মে সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই দানব। একজন বলল, 'স্লাইড বাছাই করতে সাবধান!'

'আমরা জানি কোনটা বাছাই করতে হবে,' সুর মিলিয়ে জবাব দিলাম আমি। 'স্লাইড নম্বর টেন। দু'জনেই চড়ব ওটাতে। একসঙ্গে।'

আমাদের কাছাকাছি যে দানবটা রয়েছে সে আমাদেরকে স্লাইডে চড়তে ইশারা করল। মুসার দিকে তাকালাম। ঠিক আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে। চোখে ভয়।

আমার শার্ট খামচে ধরে টান দিল সে। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'না হওয়ার কি আছে?' অধৈর্য স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

'সত্যি যদি সাইনবোর্ডে লেখা সাবধান-বাণীটা ঠিক হয়?'

'বোকার মত কথা বোলো না,' ধমকে উঠলাম। 'এটা একটা অ্যামিউজমেন্ট পার্ক–বিনোদনের জন্যে আসে এখানে মানুষ, ভুলে গেছ? এখানে কাউকে খুন করার জন্যে কিংবা নরকে পাঠানোর জন্যে ডেকে আনা হয় না। টিকেট কেটে কেউ মরতে আসে নাকি?'

ঢোক গিলল মুসা, 'ঠিক বলছ?'

'তাই তো বলছি। রবিনকে খুঁজতে কি যাবে এখন, না কি?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'চলো তাহলে,' বলে পা বাড়ালাম দশ নম্বর স্লাইডটার দিকে।

স্লাইডের মাথায় বসে পড়লাম। আমার ডান পাশে বসল মুসা। দু'জনেই সামনের দিকে পা লম্বা করে দিলাম।

সামনের দিকে কাত হয়ে গেল বোর্ড।

পিছলে নামা শুরু হলো আমাদের।

চিৎকার করে বললাম, 'রবিন, ঘাবড়াও মাত্, আমরা আসছি!'

সাত

এবার আর হই-চই করলাম না আমি। কোলের ওপর হাত রেখে দাঁতে দাঁত চেপে স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

রাইডে চড়ে মজা পাওয়ার মত মনের অবস্থা নেই আর আমার এখন। আমি শুধু এটার শেষ মাথায় পৌঁছতে আগ্রহী, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। রহস্যটার সমাধান করে রবিনকে পেতে চাই।

পিছলে নামতে নামতে আচমকা আমাকে খামচে ধরল মুসা। বড় বড় উঁচুনিচু ঝাঁকিগুলোতে মুখ বন্ধ রাখতে পারল না সে। চিৎকার করতে থাকল।

তারপর দু'জনেই চিৎকার করে উঠলাম যখন খাড়া হয়ে গেল স্লাইডের ঢাল। প্রায় খাড়া ভাবে নিচে পড়তে শুরু করলাম।

আছড়ে পড়লাম নিচে। ওখান থেকে ডানে তীক্ষ্ণ মোড় নিল স্লাইড। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছি এখন দু'জনেই। ঠেকাতে পারছি না।

দ্রুত, আরও দ্রুত নেমে চলেছি। বেড়েই চলেছে গতি। অন্ধকারে এ এক ভয়ানক অনুভূতি। অন্ধকারও বাড়ছে। কোথায় চলেছি দেখার উপায় নেই। কিছুই চোখে পড়ছে না। এমনকি সামনে বাড়িয়ে রাখা আমার পায়ের জুতোও দেখা যাচ্ছে না।

এত শক্ত করে আমার কোমর জড়িয়ে ধরেছে মুসা, দম নিতে পারছি না। ছাড়তে যে বলব, কিংবা আস্তে ধরতে বলব তারও উপায় নেই–বলে কোন লাভ হবে না, নিজের চিৎকারের শব্দেই কিছু শুনতে পাবে না।

নিচে। নিচে।

অন্ধকার। অন্ধকার।

আবার প্রায় খাড়া একটা পতন। ঝাঁকুনির চোটে ফুসফুস খালি করে বাতাস বেরিয়ে গেল আমাদের। পরক্ষণে ওপরে ওঠা। তারপর আবার নামা। একই সঙ্গে মোড় নেয়া–বাঁয়ে তীক্ষ্ণ মোড়।

মনে হতে লাগল, এতক্ষণে তো গোড়ায় পৌঁছে যাওয়ার কথা আমাদের।

বহুক্ষণ ধরে স্লাইড করেই চলেছি আমরা।

দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছি আগেভাগেই, দেহকে তৈরি করে রেখেছি; কখন স্লাইডের মুখ খুলে যাবে, উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ব আমরা সেই আশঙ্কায়।

কিন্তু কোন মুখ খুলল না।

পিছলে চলাও বন্ধ হলো না আমাদের।

বরং গতি যেন আরও বেড়ে গেল। জোরে জোরে দম নিচ্ছি। ভেজা ভেজা, গরম, বদ্ধ বাতাসে শ্বাস নিতে নিতে অস্থির লাগছে।

হঠাৎ করেই উঁচু, আবার হঠাৎ করেই নিচু হয়ে যাচ্ছে স্লাইড, বাঁক নিচ্ছে, মোড় ঘুরছে। ঘন অন্ধকারে আমাদের যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

অনন্তকাল ধরেই এ ভাবে চলতে থাকব নাকি?

তবে কি সাইনবোর্ডের সাবধান-বাণী মিথ্যে নয়?

ভয়ানক ভাবনাগুলো মন থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু অন্ধকার মানুষের মনের ভয় বাড়িয়ে দেয়। কোথায় রয়েছি কোন্‌দিকে যাচ্ছি দেখতে পেলেও ভয় কিছুটা কম লাগত।

হঠাৎ করেই বড় বেশি চুপচাপ হয়ে গেছে মুসা। টুঁ শব্দ করছে না আর। ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি অবস্থা তোমার? আছো ঠিকঠাক?'

'জানি না!' আমার কোমরে হাতের চাপ শক্ত হলো তার। 'এ ভাবে পিছলে চলেছি কেন আমরা? থামব না কোনদিন?'

'উহ্‌, আস্তে! ব্যথা দিচ্ছ!' না পেরে চিৎকার করে উঠলাম।

হাতের চাপ সামান্য শিথিল করল সে। কানের কাছে আচমকা ফেটে পড়ল, 'এ সব আমার আর ভাল্লাগছে না!'

প্রচণ্ড আরেকটা ঝাঁকুনি। আমার কোমর থেকে হাত ছুটে গেল তার।

তারপর আরও একটা ঝাঁকুনি। আরও জোরে। মনে হলো স্লাইড থেকে উড়ে চলে যাব। আছড়ে পড়ব নিচে। যদি 'নিচে' বলে কোন কিছু আদৌ থাকে।

নামা। নামা।

আঠা আঠা কি যেন লেগে গেল মুখে। বিশ্রী কোন জিনিস। চিৎকার করে উঠলাম দু'জনেই। দুই হাতে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলাম।

'মাকড়সার জাল!' চিৎকার করে বলল মুসা।

'সে-রকমই তো লাগছে,' জবাব দিলাম। 'কি বিশ্রী! ঘন। আঠাল।'

সারা মুখ চুলকাচ্ছে। আঠাল জালের মত মুখে লেগে গেছে জিনিসটা। দুই হাতে খামচে, টেনে তুলে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলাম।

খাড়া আরেকটা পতন শুরু হতেই আবার চিৎকার করে উঠলাম।

ততক্ষণে আঠাল জাল মুখ থেকে অনেকখানি তুলে ফেলেছি। কিন্তু চুলকানো কমছে তো না-ই, আরও বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন হাজারখানেক পিঁপড়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে মুখের চামড়ায়।

'বাপরে! সহ্য করতে পারছি না!' চেঁচানো শুরু করল মুসা। 'আমার মুখ...মুখ...!'

ঘন অন্ধকারে নামা...নামা... নামা...নেমেই চলেছি।

তারপর উজ্জ্বল আলো যেন বিস্ফোরিত হলো চোখের সামনে। এত সাদা, চোখের পাতা বুজে গেল আপনি।

দিনের আলো? বাইরে বেরোতে চলেছি?

না।

জোর করে চোখের পাতা মেলে তাকালাম।

আগুনের দিকে ছুটেছি। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুনের লেলিহান শিখা।

স্লাইডের সামনে আগুন! নরক?

কমলা-হলুদ গনগনে আগুন। কালো ধোঁয়ার পর্দা।

দুই হাত উঠে এল মুখের কাছে। চিৎকারটা বেরিয়ে আসছে আপনাআপনি।

জ্বলন্ত আগুনের দিকে ধেয়ে চলেছি। সোজা গিয়ে পড়ব এখন তাতে।

'পুড়ে মরব! পুড়ে মরব!' প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করে দিল মুসা। 'বাঁচাও! বাঁচাও! কে আছো, বাঁচাও আমাদের!'

আট

চোখ বুজে ফেললাম। ভয়াবহ আঁচে চামড়া পোড়ার অবস্থা। বোমা বিস্ফোরণের উত্তাপ যেন।

পুড়ে যাচ্ছি। পুড়ে মরতে যাচ্ছি। আমার মন বলল।

সত্যি পুড়ছি?

হুস্ করে এসে গায়ে লাগল এক ঝলক শীতল বাতাসের ঝাপটা। চোখ মেললাম।

আগুন এখন আমাদের পেছনে। ওটার ভেতর দিয়ে উড়ে পার হয়ে চলে এসেছি।

মোড় নিলাম আবার। তবে এবারে আর তীক্ষ্ণ মোড় নয়। অনেক সহনীয়। ঠাণ্ডা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পিছলে চলেছি আমরা। পেছনের কমলা আগুনের আভা এখনও প্রতিফলিত হচ্ছে সামনের কালো অন্ধকারের পর্দায়।

মুসা আর আমি দু'জনেই নীরব হয়ে গেছি। বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ডটার হাতুড়ি পেটানো বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায় আছি আমি।

'দুর্দান্ত স্পেশাল ইফেক্ট!' আচমকা চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'মনে রাখার মত।' তারপর হা-হা করে হেসে উঠল। হাসিটা মোটেও স্বাভাবিক মনে হলো না। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!

আগুনটা ভুয়া, আমিও বুঝে গেছি। কোনও ধরনের প্রজেকশনের মাধ্যমে করেছে, কিংবা অন্য কিছু। উত্তাপটাও ছড়ানো হচ্ছে মেশিনের সাহায্যে।

'শেষ হবে কখন এই রাইড?' মুসার প্রশ্ন। চড়া হয়ে উঠেছে কণ্ঠস্বর। ভীত-সন্ত্রস্ত।

শেষ হবে না কোনকালেও, মনে হলো আমার। এখন বিশ্বাস হতে শুরু করেছে, সত্যিই হয়তো অনন্তকাল ধরে এ ভাবে পিছলে বেড়াতে হবে আমাদের।

ভয়ঙ্কর সব ভাবনা খেলে যেতে থাকল মনের মধ্যে। আশা যখন ছেড়ে দিয়েছি, বেরোনো আর হবে না কোনদিন ভাবছি, ঠিক এই সময় স্লাইডের সামনের মুখটা খুলে যেতে দেখলাম। চুইয়ে ঢুকছে দিনের আলো।

ধড়াস!

শক্ত মাটিতে ঘাসের ওপর এসে আছড়ে পড়লাম।

মুহূর্ত পরেই মুসাও এসে আছড়ে পড়ল আমার পেছনে।

চোখ মিটমিট করতে লাগলাম। উজ্জ্বল রোদের আলো সইয়ে নেবার জন্যে।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ডটা।

হলুদ আর সবুজ রঙ করা একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেলাম ঠিক আমাদের সামনে। তাতে লেখা: **নিঃসঙ্গতা আর ধ্বংসের জগতে স্বাগতম। জনসংখ্যা: ০।**

বোর্ডটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে রবিন। আমাদের দেখে দৌড়ে এল। মুখে হাসি। কাছে এসে আমার বাহুতে চাপড় দিয়ে বলল, 'কোথায় ছিলে তোমরা এতক্ষণ?'

ওর কাঁধ চাপড়ে দিল মুসা। 'তুমি কোথায় ছিলে?'

'আমি এখানেই ছিলাম,' রবিন জানাল। 'কোথায় রয়েছি বুঝতে পারছিলাম না। আমি মনে করেছি পার্কের আরেক প্রান্ত এটা। স্লাইড থেকে বেরিয়ে তোমাদের দেখলাম না। তোমাদের অপেক্ষায়ই দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'প্রথমে স্লাইড থেকে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়েছি আমরা,' মুসা জানাল। 'তোমাকে খুঁজেটুজে না পেয়ে শেষে গিয়ে আবার উঠলাম দশ নম্বরটাতে। কি একখান চড়াই না চড়লাম, বাপরে!'

স্লাইডে চড়ার ভয়ানক সময়টার কথা কল্পনা করে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়েও গায়ে কাঁটা দিল তার।

'এমন একখান স্লাইডই বেছে নিলে। বাপরে বাপ!' রবিনের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই যেন মুসার।

'হ্যাঁ, সত্যিই ভয়ানক,' স্বীকার করল রবিন। 'এ রকম হবে জানলে কে চড়তে যেত। বিশেষ করে আগুনের ব্যাপারটা...'

'ও এক সাংঘাতিক স্পেশাল ইফেক্ট,' মুসা বলল। 'জায়গাটা সত্যি ভয়ানক। রাইডগুলো রীতিমত একেকটা আতঙ্ক হবে বোঝাই যাচ্ছে।'

'স্লাইডটাকে এত দীর্ঘ বানাল কি ভাবে ওরা, সেটাই এক বিস্ময়,' রবিন বলল। রোদে চকচক করছে ওর বাদামী চুল। 'এমন ভাবে তৈরি করেছে, চড়তে গিয়ে একটা সময় মনে হতে থাকে এ চড়ার যেন আর শেষ হবে না

কোনদিন।'

'কোটি টাকা দিলেও ওর রাইডে আর নেয়াতে পারবে না কেউ আমাকে,' মুসা বলল।

মুসা আর রবিনের কথা শুনছি আর চারপাশে তাকিয়ে দেখছি আমি। রবিনের অনুমান ঠিকই। মনস্টারল্যান্ডের আরেক অংশে রয়েছি আমরা। একটা জিনিসও পরিচিত লাগছে না।

কোথাও আমাদের মত কোন মানুষকে চোখে পড়ল না। চওড়া রাস্তাটায় কয়েকটা দানব-ছেলেমেয়েকে দেখা গেল। বেদিং সুট পরে বালিতে ঢাকা রাস্তা ধরে সাঁতার কাটতে যাচ্ছে। রাস্তার ধারে সাইনবোর্ড লাগানো: **অ্যালিগেটরের জলা**।

ডানে, কাঁচ দিয়ে তৈরি একটা চারকোনা বিল্ডিং দেখতে পেলাম। কাঁচের গায়ে উজ্জ্বল রোদ প্রতিফলিত হয়ে চমকাচ্ছে। এত উজ্জ্বল, মনে হচ্ছে আগুন ধরে গেছে ওগুলোতে। চোখ কুঁচকে ওটার দিকে তাকিয়ে সামনে লেখা সাইনবোর্ডটা পড়লাম কোনমতে: **হাউস অভ মিররস**।

মুসা বলল, 'ঢুকবে নাকি? দেখবে কি আছে?'

'তারচেয়ে বরং চাচা-চাচীকে খুঁজে বের করি আগে,' আমি বললাম।

'তাঁরা তো আছেনই। পার্কের ওদিকটাতে চলে গেলেই পাওয়া যাবে।' রবিনের হাত ধরে টান দিল মুসা। 'চলো, ওর ভেতরে কি আছে দেখি গিয়ে।'

'কিন্তু ওরা যদি আমাদের খোঁজাখুঁজি করে?' মুসাকে বললাম।

'করলে অসুবিধে নেই। পার্কটাতে লোকজন তো নেইই। ভীড় নেই। এদিকে এলেই পেয়ে যাবেন।' রবিনের দিকে তাকাল আবার সে। 'চলো। আমার কাছে মনে হচ্ছে খুব মজার জায়গাই হবে ওই আয়নাঘর।'

আমি যেতে দ্বিধা করতে লাগলাম। চাচা-চাচীর কথা ভেবে। কাঁচের বাড়িটার চোখ ধাঁধানো সাদা উজ্জ্বলতার দিকে তাকালাম।

পিঠে টোকা দিল কে যেন।

চমকে গেলাম। চিৎকার করে ফিরে তাকালাম।

সবুজ পোশাক পরা এক দানবকে দেখলাম দাঁড়িয়ে থাকতে। বড় বড় হলুদ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ফিসফিস করে সাবধান করল আমাকে, 'সময় থাকতে পালাও।'

দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল সে। কেউ নজর রাখছে কিনা দেখছে যেন। আবার সাবধান করল। 'প্লীজ! সময় থাকতে পালাও! তোমার ভালর জন্যেই বলছি!'

নয়

এতটাই চমকে গেছি, কথা বেরোল না মুখ দিয়ে। থপ্ থপ্ করে দৌড়ে চলে যেতে দেখলাম ওকে। জোরে দৌড়াতে পারছে না। বোধহয় ফোলা বেঢপ পোশাকটার জন্যেই। চত্বরের ওপর দিয়ে গোলাপী লেজটা টানতে টানতে চলে গেল সে।

'কি বলল ও?' ডেকে জিজ্ঞেস করল রবিন। কাঁচের ঘরের কাছে চলে গেছে সে আর মুসা।

কাঁচের গায়ের আলোর জন্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, দৌড়ে গেলাম ওদের কাছে। বললাম, 'সাবধান করল। বলল, সময় থাকতে যেন চলে যাই।'

হেসে উঠল মুসা। 'এই দানবের পোশাক পরা লোকগুলো কিন্তু ভারী মজার। ভয় দেখানোর ওস্তাদ।'

তবে রবিন হাসল না। চশমার আড়াল থেকে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'রসিকতা করেছে লোকটা, তাই না?'

'কি জানি!' আমার কেন যেন সন্দেহ হতে শুরু করেছে। 'তবে রসিকতাই হবে, এ ছাড়া আর কি?'

ফিরে তাকালাম। দানবের পোশাক পরা লোকটাকে চলে যেতে দেখলাম। উঁচু একটা নীল রঙের পিরামিড আকৃতির বাড়ির ওপাশে।

'নিশ্চয় এটাই ওর কাজ,' মুসা বলল। 'ঘুরে ঘুরে সারাদিন মানুষকে ভয় দেখানো।'

'সত্যি সত্যি সাবধান করেনি তো?' আমার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল রবিন।

'উঁহু, মনে হয় না,' জবাবটা দিয়ে দিল মুসা। 'দূর! এত সব ভাবনা-চিন্তা বাদ দিয়ে চলো তো যাই। জায়গাটা দারুণ মনে হচ্ছে আমার কাছে। ভয় পাচ্ছ তুমি, তাই না?'

উদ্বিগ্ন ভাবটা কাটল না রবিনের। 'জায়গাটা শুরু থেকেই আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে। কিশোর, তোমার মনে হচ্ছে না?'

'সত্যি বলব? হচ্ছে,' আমি বললাম। 'তবে এখনই কোন মন্তব্য করার সময় আসেনি।'

আয়নাঘরের দিকে এগোল দু'জনে। আমি চললাম ওদের পেছন পেছন। আরেকটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল, চিমটি না কাটার জন্যে সাবধান করেছে।

চিমটি কাটতে মানা করছে কেন এ ভাবে? রহস্যটা কি? চিমটিকে ভয়

পায় নাকি দানবরা? আশ্চর্য!

ঘরে ঢোকার মুখে রয়েছে হলুদ আর সবুজ রঙ করা সাইনবোর্ড: **হাউস অভ মিররস। ঢোকার আগে ভালমত নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নাও। পরে আর কেউ তোমাকে কোনদিন দেখতে পাবে না।**

'অ্যাই, শোনো,' ডাক দিলাম। কিন্তু ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে মুসা আর রবিন।

আমিও ঢুকলাম। সরু, অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গ। বাইরের আলোর উজ্জ্বলতা চোখে আটকে রয়েছে এখনও। তাই কিচ্ছু দেখতে পেলাম না।

'মুসা, রবিন—দাঁড়াও!' চিৎকার করে বললাম। সুড়ঙ্গের নিচু ছাতে প্রতিধ্বনি তুলল আমার কণ্ঠস্বর। সামনে থেকে ওদের হাসির শব্দ কানে এল।

অন্ধের মত পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চললাম। মাথা নিচু করে রেখেছি, কারণ ছাত অতিরিক্ত নিচু। ধীরে ধীরে অন্ধকার সয়ে এল চোখে।

শেষ হলো সুড়ঙ্গ। সরু একটা করিডরে আবিষ্কার করলাম নিজেকে। দু'পাশের দেয়াল আয়নায় ঢাকা। ছাতও আয়নায় ঢাকা।

আপনাআপনি অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছি আয়নার মধ্যে। ডজন ডজন প্রতিবিম্ব। চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে আমাকে।

একটা মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালাম। আঙুল চালালাম চুলে। অস্বস্তি বোধ করছি। ডাক দিলাম ওদের নাম ধরে, 'মুসা, রবিন! কোথায় তোমরা?'

সামনে থেকে সাড়া এল ওদের। দেখতে পেলাম না। হেসে বলল রবিন, 'এসো। আমাদের খুঁজে বের করো।' কণ্ঠ শুনেই বুঝতে পারলাম মজা পেতে শুরু করেছে।

আয়না লাগানো করিডর ধরে দ্রুত হেঁটে গেলাম। ডানে বেঁকে গেছে দেয়াল। তারপর বাঁয়ে। আমার প্রতিবিম্ব অনুসরণ করছে আমাকে। আয়নার ভেতরে গভীরভাবে বসে যাওয়া ডজন ডজন প্রতিবিম্ব। যতই এগোচ্ছি ছোট হয়ে আসছে প্রতিবিম্বগুলো, কোথাও কোথাও বিকৃতভাবে ছড়ানো।

'অ্যাই, বেশি দূরে যেয়ো না কিন্তু!' চিৎকার করে বললাম।

সামনে থেকে হাসি শুনতে পেলাম। তারপর ভারী পায়ের শব্দ ভেসে এল আয়নায় ঢাকা দেয়ালের অন্যপাশ থেকে।

করিডর ধরে ধীরপায়ে এগোতে লাগলাম। সাবধানে। সামনে একটা সরু দরজামত দেখা গেল। বেরোনোর পথ।

'এই, দাঁড়াও তোমরা। আমি আসছি।' ডাক দিলাম।

খোলা মুখটা দিয়ে বেরোতে গেলাম। কপালে লাগল বাড়ি। নিরেট কাঁচ।

আঁউক করে উঠে কপাল চেপে ধরলাম। তীব্র ব্যথা কপাল থেকে ঝাঁকি

দিয়ে যেন ঘাড় আর মেরুদণ্ড বেয়ে নিচে নেমে চলে গেল। মাথার মধ্যে বোঁ করে উঠল।

দুই থাবা কাঁচের ওপর চেপে ধরে ব্যথা কমা আর মাথার মধ্যের ঝিমঝিমানি ভাবটা দূর করার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'কিশোর, কোথায় তুমি?' মুসার ডাক শোনা গেল।

'এই যে এখানে। কপালে বাড়ি খেয়েছি।' কপাল ডলতে ডলতে জবাব দিলাম।

তার আর রবিনের হাসি শোনা গেল। আয়নাঘরে ঢুকে খুব মজা পাচ্ছে দু'জনে। ওদের কণ্ঠস্বর এখন আমার পেছনে মনে হচ্ছে। ফিরে তাকালাম। শুধুই আয়না চোখে পড়ল। বেরোনোর কোন পথ দেখতে পেলাম না।

কপালটা ব্যথা করছে এখনও। তবে ঝিমঝিমানি দূর হয়েছে। আবার হাঁটতে শুরু করলাম। সতর্ক রইলাম যাতে আবার কোন কিছুতে বাড়ি খেয়ে না বসি। দুই হাত সামনে বাড়িয়ে রাখলাম। বাড়ি খাওয়ার মত কোন কিছু থাকলে আগে হাতে লাগুক।

একটা মোড় ঘুরে এসে আরেকটা ঘরে ঢুকলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, এ ঘরের মেঝেটাও আয়নায় ঢাকা। দেয়ালে, ছাতে, মেঝেতে–সব জায়গায় আয়না। মনে হতে লাগল আয়নার বাক্সের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি।

সাবধানে কয়েক কদম এগোলাম। নিজের প্রতিবিম্বের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত মনে হতে লাগল।

হাঁটার সময় জুতোর ওপর-নিচ, দুইই দেখতে পাচ্ছি। প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে হাঁটাও কঠিন। খালি মনে হয়, এই বুঝি গেলাম পড়ে।

'অ্যাই, কোথায় তোমরা?' ডেকে জিজ্ঞেস করলাম।

জবাব নেই।

পেটের মধ্যে আবার সেই খামচি দিয়ে ধরার মত অনুভূতি হলো।

'রবিন! মুসা! কোথায় তোমরা?' চিৎকার করার সময় আয়নার মধ্যে নিজের মুখ নড়তে দেখছি। ডজন ডজন মুখ। নিজের কানেই বেখাপ্পা লাগল কথাগুলো। কাঁপা কাঁপা, তীক্ষ্ণ।

'রবিন? মুসা?'

নীরবতা।

'বোকা বানানোর চেষ্টা কোরো না আমাকে!' জোরে চিৎকার করে উঠলাম। 'কোথায় তোমরা?'

নীরবতা। সাড়া নেই।

চারপাশের অসংখ্য প্রতিবিম্বের দিকে তাকাতে লাগলাম। সবগুলো মুখকেই ভীত মনে হচ্ছে এখন।

'রবিন? মুসা?'

গেল কোথায় ওরা?

দশ

নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভয়ানক সব ভাবনা খেলে যেতে থাকল মনে।

সত্যি ওরা গায়েব হয়ে গেল না তো?

নাকি কোনও ধরনের ফাঁদে আটকা পড়ল? আয়নার গোলক-ধাঁধায় হারিয়ে গায়েব হয়ে গেল?

দূর, কি যা তা ভাবছি!

তবে, স্বীকার না করে পারলাম না, মনস্টারল্যান্ড জায়গাটা সত্যি ভয় ধরাতে পারে। আরও একটা ব্যাপার বোঝা কঠিন, এগুলো ভয় দেখানোর খেলা, নাকি অন্য কিছু। জায়গাটা কি বিপজ্জনক? না মস্ত এক ভয়াল রসিকতা?

'রবিন? মুসা?'

গলা কাঁপছে আমার। চতুর্দিকে তাকিয়ে বেরোনোর পথ খুঁজতে লাগলাম।

নীরবতা।

তারপর কানে এল চাপা হাসি।

ফিসফিসে কণ্ঠস্বর। কাছেই।

আবার হাসি। জোরাল। মুসার হাসি।

আমার সঙ্গে রসিকতা করছে ওরা।

'এই, এতে মজার কি দেখলে?' রেগে গেলাম।

হা-হা করে হেসে উঠতে শুনলাম দু'জনকে।

'এসো, খুঁজে বের করো আমাদের,' ডেকে বলল মুসা।

'এতক্ষণ লাগাচ্ছ কেন?' হাসতে হাসতে বলল রবিন। 'বুদ্ধি খাটাও। বুদ্ধি।'

আবার হাসির শব্দ। আমার সামনে।

গাধা মনে হচ্ছে নিজেকে। আয়নায় হাত রেখে একপাশ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। ডান দিকে মোড় নিল হলওয়ে। সামনে একটা দরজা। কপাল ঠুকে যাওয়ার ভয়ে মাথা নিচু করে ফেললাম।

আরেকটা ছোট ঘরে আবিষ্কার করলাম নিজেকে। চারপাশে আয়না। ওপরে, নিচে, সবখানে আয়না। বিচিত্র ভঙ্গিতে কাত করে রাখা হয়েছে কিছু কিছু আয়না। তাতে আমার প্রতিবিম্বগুলো বাড়ি খাচ্ছে একটার সঙ্গে আরেকটা।

'কোথায় তোমরা? কাছাকাছি চলে এসেছি আমি,' ডাক দিয়ে বললাম।

ঘরের ভেতর দিয়ে এগোনোর সময় আলো কমে আসতে শুরু করল। অন্ধকার ছাপ পড়তে শুরু করল প্রতিবিম্বগুলোতে। বড় হতে লাগল ছায়া।

'তোমাকে এখন আর দেখতে পাচ্ছি না!' রবিন জানাল।

'আরে তাড়াতাড়ি করো না!' শোনা গেল মুসার অধৈর্য কণ্ঠ। 'নইলে একেবারেই হারিয়ে ফেলব!'

'তাড়াতাড়ি তো করছি!' চিৎকার করে জানালাম। 'কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছি না তোমাদের। নোড়ো না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকো। নইলে সত্যিই হারিয়ে ফেলব।'

'আছি!' জবাব দিল মুসা।

'বেরোব কি করে এখান থেকে?' রবিনের প্রশ্ন।

মাথায় বাড়ি খেয়ে আবার আঁউক করে উঠলাম।

প্রচণ্ড রাগে কিল মেরে বসলাম কাঁচের গায়ে।

মজা নয় এগুলো। অত্যাচার। কারণ যারা বানিয়েছে তারা জানে ব্যথা পাবে মানুষ।

'জলদি করো!' কাছেই কোনখান থেকে ডাক দিল মুসা।

'আসছি!' কপাল ডলতে ডলতে দ্রুতপায়ে এগোতে থাকলাম।

মোড় ঘুরে একটা চওড়া ঘরে ঢুকলাম। আয়না নেই এ ঘরটাতে। দেয়ালগুলো কাঁচের তৈরি। মুসাকে চোখে পড়ল।

'যাক, পেলে তাহলে শেষ পর্যন্ত,' বলে উঠল সে। 'কিন্তু আমাদের দেখনি কেন তুমি?'

'আয়নাগুলো নিশ্চয় ওরকম করেই সাজানো, যাতে পেছনে থাকলে সামনের কাউকে চোখে না পড়ে,' জবাব দিলাম। 'তা ছাড়া বার বার মাথায় বাড়ি খেতে থাকলে দেখব আর কখন...চলো, বেরিয়ে যাই। রবিন কোথায়?'

'খাইছে!' চারপাশে তাকিয়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল মুসার। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল। 'এখানেই তো ছিল! ঠিক এইখানে!'

'দেখো, মুসা,' কঠিন কণ্ঠে বললাম, 'জায়গাটা আমার ভাল লাগছে না। বুঝতে পারছি নিছক মজা নয় এগুলো। কোথায় যেন কি একটা গোলমাল রয়েছে। তোমাদের লুকোচুরি আর ভাল্লাগছে না আমার। রবিন, কোথায় লুকিয়েছ?'

'লুকাইনি তো,' জবাব দিল রবিন। 'এই যে, এখানেই আছি আমি।'

রবিনের কণ্ঠ লক্ষ্য করে কয়েক কদম এগোতেই চোখে পড়ল ওকে। কাঁচের দেয়ালের একটা ঘন ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। কাঁচের গায়ে দুই থাবা ছড়িয়ে চেপে রেখেছে।

'ওখানে গেলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'বেরোনোর পথ খুঁজছি,' জবাব দিল রবিন। 'খুঁজে পাচ্ছি না।'

এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। দাঁড়িয়ে গেলাম। পরিষ্কার, স্বচ্ছ কাঁচের

অন্যপাশে রয়েছে সে, এপাশে নয়। আমি আর মুসা রয়েছি আরেক ঘরে।

'দরজা কোনখানে?' চারপাশে তাকাতে লাগলাম।

'কি বলছ তুমি?' মুসাও অবাক। আমার মতই চারপাশে তাকানো শুরু করল।

'তুমি আর আমি–আমরা অন্য ঘরে রয়েছি। রবিন আলাদা ঘরে,' মুসাকে বোঝালাম। এগিয়ে গিয়ে রবিনের সামনের কাঁচের গায়ে চাপড় দিলাম।

আমার কাছে আসতে গিয়ে যেন অদৃশ্য দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। 'খাইছে! আমার সামনেও তো দেয়াল। এটা এখানে এল কি করে?'

বেরোনোর পথ খুঁজতে শুরু করল রবিন। কাঁচের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল।

'যেখানে আছো দাঁড়িয়ে থাকো। ঝুঁকি নেয়ার দরকার নেই,' মুসাকে বললাম। 'আমি এদিকটায় খুঁজছি।'

রবিনের বুদ্ধি অনুসরণ করলাম। কাঁচের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে খুব ধীরে ঘুরতে শুরু করলাম ছোট্ট ঘরটাতে। আলো খুব সামান্য। হাঁটার সময় কাঁচের গায়ে আমার ছায়া পড়ছে। কাঁচের মধ্যে আমার ছায়ায় ঢাকা প্রতিবিম্ব লক্ষ করলাম। চোখ দুটো তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মরিয়া। দুশ্চিন্তায় ভরা।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই পুরো এক পাক ঘুরে গেলাম পুরো ঘরটা।

যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে ফিরে এলাম। কোনও পথ পেলাম না। কোন দরজা নেই।

বেরোনোর কোন উপায় নেই।

'এই, আমি এখানে আটকা পড়েছি!' তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল রবিন।

'আমিও,' জানালাম।

'পথ তো একটা নিশ্চয় আছে,' মুসা বলল। 'নাহলে ঢুকলাম কি করে?'

'তা তো বটেই,' জবাব দিলাম। 'যে পথে ঢুকেছি সেপথ দিয়েই বেরোনোর চেষ্টা করব।'

রবিনের মত দেয়ালে হাত বুলিয়ে খুঁজতে খুঁজতে দ্রুত এগোলাম।

বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। পেটের ভেতরে অদ্ভুত এক শূন্য অনুভূতি, প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে যেন। বেরোনোর পথ তো নিশ্চয় আছে। আছেই।

কাঁচের গায়ে কিল মারতে শুরু করেছে মুসা। রবিন ওদিকে পথ খুঁজতে গিয়ে রীতিমত দৌড়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে থেমে প্রাণপণে ঠেলে কাঁচ সরানোর চেষ্টা করছে।

আমার ঘরটাতে দুই বার চক্কর দিয়ে এলাম আমি। পথ খুঁজে বের করার নিরর্থক চেষ্টা।

বেরোনোর কোন পথ পেলাম না।

'এ তো বদ্ধ এক কাঁচের বাক্স!' নিজেকেই যেন বোঝালাম। 'কাঁচের ফাঁদে আটকা পড়েছি আমরা। এখনও অক্সিজেন আছে বাতাসে, তাই শ্বাস নিতে পারছি। বাতাসও কি বন্ধ হয়ে যাবে?'

'কি করব এখন!' ভয় পেয়েছে রবিন। খানিক আগের হাসি হাসি ভঙ্গিটা পুরো উধাও।

কাঁচের দেয়ালে কিল মেরেই চলেছে মুসা।

'মুসা, থামো!' আমি বললাম। 'এ ভাবে কিলাকিলি করে কিছুই করতে পারবে না। অভঙ্গুর কাঁচ। হাতুড়ি দিয়ে পিটালেও ভাঙবে না।'

আস্তে করে হাত দুটো নামিয়ে নিল মুসা। 'অবাক কাণ্ড! যে দিক দিয়ে ঢুকলাম সেটাই মিলিয়ে গেছে বেমালুম!'

'ট্র্যাপডোর থাকতে পারে।' বলে আয়না বসানো মেঝেতে খুঁজতে শুরু করলাম। আলো এত কম, কিছু থাকলেও খুঁজে বের করা কঠিন। মেঝের কোথাও কোন ফাটল কিংবা দাগ চোখে পড়ল না।

ফিরে এলাম কাঁচের দেয়ালের কাছে। 'নাহ্, কোন লাভ হলো না।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মুসা আর রবিন। চোখেমুখে স্পষ্ট আতঙ্ক। ওদের চেয়ে কম ভয় পাচ্ছি না আমি নিজেও। আমি যে ভয় পেয়েছি সেটা জানলে ভেঙে পড়বে ওরা। বহু কষ্টে চেপে রাখলাম, প্রকাশ পেতে দিলাম না।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম মুসার পাশের দেয়ালটায়।

যেই চাপ লাগল, অমনি নড়তে শুরু করল দেয়াল।

জোরে এক চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে সরে দাঁড়ালাম।

দেয়ালটা সরে আসছে আমার দিকে।

পিছিয়ে গেলাম। এতক্ষণে লক্ষ করলাম, চারপাশের দেয়ালই এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

'মুসা!' আমার মতই পিছিয়ে যেতে দেখলাম ওকেও। সাবধান করতে চাইলাম।

রবিনও চিৎকার শুরু করল। তার ঘরের দেয়ালগুলোও একই ভাবে চারপাশ থেকে চেপে আসছে।

ফাঁদে আটকা পড়েছি আমরা তিনজনেই।

মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম একটা দেয়ালের ওপর। গায়ের জোরে ঠেলে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলাম।

কোন লাভ হলো না। ঠেকাতে পারলাম না।

ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে মাঝখানের জায়গা।

'ভর্তা করে ফেলবে!' কানে এল মুসার চিৎকার। 'কিশোর, কিছু একটা করো!'

এগারো

কি করব? নিজেকেই তো বাঁচানোর উপায় দেখছি না।

কাঁধ দিয়ে কাঁচের দেয়ালকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করল মুসা। শক্তিতে কুলাল না। ঠেলতে ঠেলতে তাকেই বরং সরিয়ে নিয়ে আসতে লাগল দেয়াল।

পিছিয়ে গেলাম। দুই হাত বর্মের মত তুলে দেয়াল ঠেকানোর চেষ্টা করলাম।

কাছে। আরও কাছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে কাঁচের দেয়াল। নিঃশব্দে।

পিছিয়ে যেতে থাকলাম। পিঠ ঠেকে গেল দেয়ালে।

আর সরার জায়গা নেই।

'আরে কেউ কিছু একটা করো! কিছু করো!' ককিয়ে উঠল রবিন।

'কাঁচের দেয়াল আমাকে পিষে ফেলছে!' মুসা চিৎকার করে উঠল। 'কিশোর···'

'আমি তো নড়তেই পারছি না!' জবাব দিলাম।

চারপাশ থেকে চেপে ধরেছে আমাকে কাঁচের দেয়াল। ওপরের কাঁচের ছাতও যে নেমে আসছে এতক্ষণ খেয়াল করিনি। মাথায় ঠেকতেই চোখ তুলে তাকালাম। মাথার কাছে এসে থেমে গেল ছাতটা।

বাতিল গাড়িগুলোকে মেশিনে পিষে ভর্তা করার দৃশ্যটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। দানবীয় ওই কম্প্যাকটর মেশিনগুলো চাপ দিয়ে আস্ত গাড়িটাকে কেমন চারকোনা একটা নিরেট লোহার টুকরোতে পরিণত করে ফেলে ভাবতেই অসাড় হয়ে এল হাত-পা।

কাঁচের দেয়ালের চাপে আমার দেহটাও ওরকম চারকোনা হয়ে যাবে, দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠলাম।

দেয়ালগুলো চারদিক থেকে চাপ দিতে আরম্ভ করতেই আতঙ্কটা আর চেপে রাখতে পারলাম না। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'কে আছো, বাঁচাও! বাঁচাও!'

বদ্ধ জায়গায় কথাগুলো কেমন বিকৃত হয়ে গেল।

দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।

সরে আসা বন্ধ হচ্ছে না দেয়ালগুলোর। চাপ। আরও বেশি চাপ।

দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করছি।

দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে দেয়ালগুলোকে ঠেকানোর শেষ চেষ্টা

করলাম।

কোন লাভ হলো না।

শেষমেষ হাড়-মাংসের চারকোনা টুকরোতে পরিণত হয়েই মরণ লেখা ছিল কপালে!

বারো

মুসা বা রবিনের কণ্ঠও এখন কানে আসছে না আর।

কানে আসছে শুধু নিজের দম আটকে যাওয়া ঘড়ঘড় শব্দ।

মারা যাচ্ছি!

চোখ বুজে ফেললাম।

হঠাৎ করেই টের পেলাম পায়ের নিচে মেঝেটা খসে পড়ে গেল।

কি ঘটছে বোঝার আগেই পড়তে শুরু করলাম। নিচে পড়ছি। দ্রুত।

এরই মাঝে কোনমতে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি, দেয়ালগুলো সব গায়ে গায়ে লেগে গেছে। নিচের খোলা মুখ দিয়ে নিচে পড়ে গেছি আমি। স্লাইড বেয়ে নেমে চলেছি দ্রুত।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বাইরে এসে পড়লাম। ঘাসের ওপর। আলতোভাবে পিছলে নেমে এসে যেন বসে পড়লাম। ব্যথা পেলাম না।

আমার পাশে এসে বসল মুসা আর রবিন।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ঘাসের ওপর বসে বসে উজ্জ্বল রোদে চোখ মিটমিট করতে থাকলাম। পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে।

'তারমানে ভাল আছি আমরা! ' অবশেষে নীরবতা ভাঙল রবিন। আস্তে করে উঠে দাঁড়াল। মুখ টকটকে লাল। নাকের ডগার কাছে নেমে এসেছে চশমাটা। আর এতটুকু নামলেও খসে পড়বে। 'বেঁচে গেছি!'

আচমকা হেসে উঠল মুসা। উল্লসিত হাসি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে লাফানো শুরু করল পাগলের মত।

ওর মত লাফাতে পারলাম না আমি। চোখের সামনে তখনও ভাসছে গাড়ি চ্যাপ্টা করে ফেলার দৃশ্যটা।

ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার দুই হাত চেপে ধরল মুসা। টেনে খাড়া করল আমাকে।

'একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন থেকে বেঁচে ফিরলাম মনে হচ্ছে,' রবিনের মুখ এখনও লাল হয়ে আছে। 'আরেকটু হলেই তো চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছিলাম।'

'সত্যিই, খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিল,' মুসা বলল। তবে তার কণ্ঠস্বরে ভয় নেই। এই একটু আগে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়ার ভয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছিল যে, ভুলে গেছে যেন এখন সেটা।

'সত্যিই ভয় কি বলছ?' ভুরু কুঁচকে মুসার দিকে তাকাল রবিন। কথা বলতে গিয়ে গলা এখনও কাঁপছে তার। 'বলো ভয়ানক।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে রবিন,' আমি বললাম, 'ব্যাপারটা সত্যিই ভয়ানক। আর এক সেকেন্ড দেরি হলেই...'

'ওটাই তো মজাটা! পুরো ব্যাপারটা ওভাবেই সাজানো,' তর্ক শুরু করল মুসা। 'এভাবেই ভয়টা দেখানো হয়। সাংঘাতিক! ওরা তোমাকে ভাবতে বাধ্য করে যে সত্যিই তুমি মারা যাচ্ছ। টাইমিং বড় সাংঘাতিক এদের, একেবার নিখুঁত।'

'তা ঠিক,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে এক আঙুল দিয়ে চশমাটা নাকের ওপরে ঠেলে দিল রবিন। চোয়াল ডলল।

'আমাদের তো কোন ক্ষতি হয়নি,' মুসা বলল। 'এই পার্কটা তৈরিই হয়েছে বিনোদনের কথা মাথায় রেখে। ভয় দেখিয়ে আনন্দ দিতে চেয়েছে। আর সেটা যদি না-ই পারল, লাভটা কি?'

'হুঁ,' মাথা দোলাল রবিন।

'কিন্তু, মুসা,' আমি বললাম, 'ভয় দেখাতে গিয়ে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিল, কিংবা কম্পিউটারের ত্রুটির কারণে টাইমিঙে গোলমাল হয়ে গেল, তখন? একটা সেকেন্ডের তো এদিক ওদিকের ব্যাপার। যদি নিচের ট্র্যাপডোরটা আটকে যেত, ধরো মাত্র দুটো সেকেন্ডের জন্যে? কি ঘটত তাহলে?'

জবাব দিতে পারল না মুসা। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। এতক্ষণে মনে হচ্ছে বাস্তব ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতে আরম্ভ করেছে ওর।

'বলো, যদি ট্র্যাপডোর আটকে যেত, তাহলে কি হতো?' আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'ভয় দেখিয়ে মজা দিতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলছে না?'

'হয়তো...হয়তো ওরা সব দিকে কড়া নজর রেখেছে।'

'তা তো রেখেছেই। কিন্তু কড়া নজর রেখে কি সব সময় যান্ত্রিক গোলযোগ এড়ানো যায়?'

'তারমানে আটকে পড়ে কেউ যদি মরেও যায়, কেয়ার করে না ওরা, এটাই কি বলতে চাইছ?' রবিনকেও চিন্তিত মনে হলো। 'এ সব ঘটনা বই-সিনেমায় ঘটে, বাস্তবে নিশ্চয় ঘটে না।'

'জানি না,' জবাব দিলাম। 'আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না ওদের উদ্দেশ্যটা কি।'

'এসব জায়গায় আরও একটা বিপদ ঘটতে পারে,' রবিন বলল, 'সবার হার্ট তো আর এক রকম নয়। ভয় পেয়ে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে কারও কারও। অতিরিক্ত আতঙ্কে মানুষের মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়।'

'ব্যাপারটাকে বড় বেশি খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছ তোমরা,' মুসা

বলল। 'শোনো, এই পার্ক বানানো হয়েছে মানুষের বিনোদনের জন্যে। মনস্টারল্যান্ড নামটার মধ্যেই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে দুর্বলচিত্তদের জন্যে নয় এই জায়গা। যার সাহস হবে না সে ঢুকবে না। তাই বলে কি মজা নেবে না মানুষ?'

কথা বলতে বলতে আমার কাঁধের দিকে তাকিয়ে রইল সে। ফিরে তাকালাম। সবুজ পোশাক পরা একটা দানবকে হেঁটে আসতে দেখলাম। হাতে এক গোছা কালো রঙের বেলুন।

দ্রুত দানবটার কাছে চলে গেল মুসা। কোন রকম ভূমিকা না করে জিজ্ঞেস করল, 'এ ভাই, একটা কথা বলবেন? এই পার্কে ভয় পেয়ে কখনও কোন লোক মারা গেছে?'

হাঁটা বন্ধ করল না দানবটা। শুনেও না শোনার ভান করল। হাঁটার তালে তালে মাথার ওপর নাচছে তার কালো বেলুনের গোছা। হঠাৎ কি ভেবে ফিরে তাকাল। জবাব দিল, 'মাত্র একবার।'

'তারমানে একজন লোক মারা গেছে এখানে?' মুসার প্রশ্ন।

মাথা নেড়ে দানবটা বলল, 'না। সেকথা বলিনি আমি।'

'তাহলে কি কথা বলেছেন?'

'একজন মরেছে, সেকথা বলিনি,' রহস্যময় ভঙ্গিতে জবাব দিল দানবটা। 'বললাম, একজন মানুষ মাত্র একবারই মারা যায় এখানে, দু'বার কেউ মারা যেতে পারে না। তোমরাও একবারই মরবে।'

আর কিছু না বলে, আমাদেরকে একটা ধাঁধার মধ্যে ফেলে রেখে থপ্ থপ্ হেঁটে চলে গেল সে।

তেরো

ওর চলার পথের দিকে তাকিয়ে থাকলাম দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর তাকালাম মুসার দিকে, 'কি, এখনও কিছু সন্দেহ হচ্ছে না তোমার? বাইরে থেকে সব স্বাভাবিক দেখালেও ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন কি একটা ঘাপলা আছে বলে মনে হচ্ছে না?'

জবাব দিতে পারল না মুসা।

রবিন বলল, 'কি বলতে চাও?'

'বলাবলি পরের কথা,' দৃঢ়কণ্ঠে বললাম। 'আগে চাচা-চাচীকে খুঁজে বের করব। তারপর এখান থেকে পালাব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমি আর কোন রাইড-ফাইডে চড়তে রাজি না। কোন কিছুর বিনিময়েই না।'

বলে মুসা বা রবিনের কোন কথার তোয়াক্কা না করে হাঁটতে শুরু করলাম, গেটটা কোন দিকে আছে অনুমান করে।

চুপচাপ আমার পেছন পেছন আসতে লাগল মুসা আর রবিন।

উদ্বিগ্ন চাচা-চাচীকে খুঁজে পেলাম নেকড়ে-গাঁয়ের ওপাশে। আমাদের দেখেই দৌড়ে এল চাচী, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ? তোর চাচা আর আমি তো চিন্তায়ই পড়ে গিয়েছিলাম।'

সব খুলে বললাম।

দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল চাচীর মুখে। মাথা দুলিয়ে বলল, 'আমার একটুও ভাল লাগছে না পার্কটা। তোর চাচাকে বলছিলাম সেকথা। চল, আর দেরি করার দরকার নেই। অনেক তো দেখা হলো। এখন বেরোনো যাক।'

গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ফোন পেয়েছিলে? গাড়িটাড়ি ঠিক করেছ?'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে চাচা বলল, 'না। একটা ফোনও পাইনি কোথাও। এই পার্কে কোন টেলিফোন সেটই নেই।'

'হুঁ! পার্কটা বড়ই রহস্যময়। সব কিছুই কেমন যেন উদ্ভট।'

আর কিছু না বলে নীরবে গেটের দিকে এগোলাম।

সেখানে আরেক চমক। বেশ কিছুটা দূরে থাকতেই বলে উঠল মুসা, 'গেট তো লাগানো। ওই দেখো, তালা দেয়া!'

চাচীও দেখল। 'নিরাপত্তার জন্যে দিয়ে রেখেছে হয়তো। কাছে গেলেই খুলে দেবে।'

গেটের কাছে এসে দাঁড়ালাম। চারপাশে তাকিয়ে কাউকে চোখে পড়ল না। চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল চাচা, 'শুনছেন? কেউ আছেন? আমরা বেরোব।'

টিকেট বুথের দরজা দিয়ে উঁকি দিল একটা দানবের মাথা।

চাচা বলল, 'আমরা বেরোব।'

নীরবে বেরিয়ে এল দানবটা। তার পেছন পেছন বেরিয়ে এল আরও কয়েকটা দানব। ঘিরে দাঁড়াল আমাদেরকে।

চাচা কিছুটা অবাকই হলো। 'কি ব্যাপার? কিছু বলবেন মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' এগিয়ে এল ওদের মধ্যের নেতা গোছের দানবটা। 'আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।'

চাচা জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'আমাদেরকে চমৎকার কিছু দৃশ্য উপহার দেয়ার জন্যে। আমাদের মনস্টার চ্যানেলে চালাব সেগুলো। সারা পৃথিবীতে বিশ লাখেরও বেশি দানব ওই চ্যানেলটা নিয়মিত দেখে। মানুষের দুর্দশা দেখে মজা পায়। দানবদের নিয়ে ছবি বানিয়ে আপনারা যেমন দেখে মজা পান। কাজটা কি অন্যায় মনে হচ্ছে?'

'কি বলছেন কিছু বুঝতে পারছি না!' চাচী বলল।

'আপনাদের একটা ভুল ভেঙে দেয়া উচিত,' দানবটা বলল। 'আপনারা হয়তো ভাবছেন, আমরা আপনাদের মত মানুষ। দানবের পোশাক পরে আছি। আসলে মোটেও তা নয়। এটাই আমাদের সত্যিকারের চেহারা।

আমরা দানবই। আপনারা নিজেদেরকে মানুষ বলতে যেমন ভালবাসেন, আমরাও নিজেদের দানব বলে গর্ব বোধ করি। যা-ই হোক, আসল কথা বলি। লোকে এই মনস্টারল্যান্ডে আসে মজা করতে। আমরা তাদের চূড়ান্ত মজা দিই। ভয় দেখাই। সেসবের ভিডিও করে রাখি।'

চাচা বলল, 'তারমানে···তারমানে মানুষকে এখানে বিনোদনের নামে ডেকে এনে অত্যাচার করেন?'

চাচার কথা এড়িয়ে গিয়ে দানবটা বলল, 'মনস্টারল্যান্ডের জায়গায় জায়গায় গোপন ক্যামেরা বসানো আছে। এখানে ঢোকার পর আপনারা আর এই ছেলে তিনটে যা যা করেছেন, সব রেকর্ড হয়ে গেছে আমাদের ভিডিও ক্যাসেটে। গাড়ি বিস্ফোরণের দৃশ্যটা সহ।'

'মানে! গাড়িটা আপনারাই ধ্বংস করেছেন?'

'গাড়িটার জন্যে দুঃখিত। তবে ওটা আর কখনও প্রয়োজন হবে না আপনাদের, সেজন্যেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।'

'প্রয়োজন হবে না মানে? কেন হবে না?'

'কারণ, আপানারা আর কখনও জ্যান্ত বেরিয়ে যেতে পারবেন না এখান থেকে,' হাসল দানবটা। 'আপনাদের ঘটানো ঘটনাগুলো রেকর্ড করার পর থেকেই আমাদের কাছে আপনাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আপনাদের যেতে দিলে ফিরে গিয়ে নিজের দলের লোক নিয়ে এসে পাইকারী হারে খুন করবেন আমাদের। পার্কটা ধ্বংস করবেন। এখান থেকে উচ্ছেদ করে ছাড়বেন আমাদের। সেটা আমরা হতে দেব কেন?'

এক মুহূর্ত চুপ থেকে দানব-নেতা বলল, 'নিন, কথা অনেক হয়েছে। এখন চলুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'কোথায় যাব?' রেগে গেল চাচী। 'দেখুন, ভাল করছেন না কিন্তু। আমরা পুলিশকে জানাব।'

'পুলিশ এখানে পাচ্ছেন কোথায়? ফোনও তো পাবেন না, যে ফোন করবেন।'

আরও রেগে গিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল চাচী, হো হো করে হেসে উঠল মুসা।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম।

'ওদের কথায় ভয় পাবেন না, আন্টি,' হাসতে হাসতে বলল মুসা। 'ওরা মজা করছে। ভয় দেখানোর জন্যে। মনস্টারল্যান্ডের এটাও একটা বানানো নাটক।'

গম্ভীর চোখে মুসার দিকে তাকাল দানব-নেতা, 'তোমার কাছে তাই মনে হচ্ছে, না? বেশ, প্রমাণ দিচ্ছি। এসো, টেনেটুনে দেখো, আমার মুখোশ আছে কিনা। খুলতে পারো কিনা।'

হাসিমুখে এগিয়ে গেল মুসা। সব রকম ভাবে টেনেটুনে দেখল। হাসি মুছে গেল তার। আতঙ্ক ফুটল চোখে। আমাদের দিকে ফিরে প্রায় ফিসফিস

করে বলল, 'পোশাক নয় ওগুলো! এরা সত্যি দানব!'

হেসে নাটকীয় ভঙ্গিতে মাথা কাত করল দানব-নেতা। তারপর সঙ্গীদের দিকে ফিরে আদেশ দিল, 'এই, নিয়ে চলো এদের।'

চোদ্দ

পালাতে পারলাম না আমরা। আমাদেরকে ঘিরে রাখল ওরা। গরুখেদানো খেদিয়ে নিয়ে এল একটা ডোবার পারে। ডোবার মধ্যে গোলাপী রঙের তরল পদার্থ। তীব্র পচা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে সেটা থেকে। ফুটফুট করে গোলাপী বুদ্বুদ উঠছে।

'কিশোর, চুপ করে আছো কেন!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'চলো, গেটের দিকে হাঁটা শুরু করি। দেখি, কি করে ওরা।'

চোখের পলকে পিস্তল বেরিয়ে এল নেতা-দানবের হাতে। বাকি সবার হাতেই পিস্তল দেখা গেল। যেন জাদুমন্ত্রের ছোঁয়ায় বেরিয়েছে অস্ত্রগুলো। পানির দিকে সেই বিচিত্র পিস্তল তাক করে ট্রিগার টিপল নেতা। গোলাপী আগুনের মত তীব্র উজ্জ্বল রশ্মি ছুটে গিয়ে লাগল গোলাপী তরলে। মুহূর্তে অনেকটা জায়গা জুড়ে গোল একটা গর্ত তৈরি হয়ে গেল আঠাল তরলের ওপরিভাগে। ধীরে ধীরে বুজে গেল আবার গর্তটা।

আর দৌড়ানোর সাহস হলো না মুসার।

হাসি ফুটল নেতার মুখে। একটা বড় পাথর তুলে নিয়ে আমাদেরকে বলল, 'দেখো!'

পাথরটা ডোবার মধ্যে ছুঁড়ে দিল সে।

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে তলিয়ে গেল, মনে হলো টেনে ওটাকে গিলে নিল ভয়ঙ্কর ওই তরল। চোরাকাদার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক।

'দেখলে তো, কত সহজে তোমাকে বিদেয় করে দেয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছি আমরা,' মুসার দিকে তাকিয়ে বলল নেতা। হাসি হাসি কণ্ঠ। 'এখন বলো, নিজে নিজেই নামবে, নাকি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেব?'

মগজের মধ্যে প্রচণ্ড গতিতে ভাবনা চলেছে আমার। কি করে বাঁচব, উপায় বের করার চেষ্টা করছি।

হঠাৎ বিদ্যুৎ-ঝলকের মত কথাটা মনে পড়ে গেল। বহু জায়গায় সাইনবোর্ড দেখেছি: **খবরদার! চিমটি কাটবে না!**

কেন লিখেছে? নিশ্চয় মজা করার জন্যে নয়। এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, এই পার্কের কোন কিছুই নিছক আনন্দ দেয়ার জন্যে কিংবা মজা করার জন্যে লেখেনি দানবেরা। এমনিতেও তো গেছি, ওমনিতেও, পরখ করে দেখতে দোষ কি?

আচমকা কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে হাত বাড়ালাম। জোরে চিমটি কাটলাম নেতার হাতে।

বিকট চিৎকার করে উঠল সে। আতঙ্ক দেখা দিল চোখে। এতই আতঙ্কিত, পিস্তল বের করার কিংবা বাধা দেবার কথাও যেন মনে রইল না। বুঝে গেলাম কাজ হচ্ছে। আবার চিমটি কাটলাম। আরও জোরে।

অদ্ভুত অবিশ্বাস্য একটা কাণ্ড ঘটল। হুস্ করে শব্দ হলো, যেন বাতাস বেরিয়ে গেল চাকার ভেতর থেকে। ফুটো বেলুনের মত চুপসে গেল দানবের দেহটা। মাটিতে পড়ে গেল সে।

'চিমটি কাটো! চিমটি কাটো!' চিৎকার করে বললাম। 'মুসা, ম্যাড পিঞ্চার হয়ে যাও। কাজে লাগবে এখন।'

চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে সবাই। আমার চিৎকারে যেন হুঁশ হলো। মুসা আর রবিন লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল দুটো দানবের সামনে। চাচা এগোল একটার দিকে। আর চাচী তার কাছাকাছি দানবটার হাত চেপে ধরল। চিমটি কাটার আগেই চেঁচানো শুরু করল দানবটা। শেষে রামচিমটি খেয়ে বেলুনের মত চুপসে গেল সে।

তাকে ছেড়ে দিয়ে আরেকটা দানবের দিকে হাত বাড়াল চাচী।

আতঙ্কিত দানবেরা ত্রাহি চিৎকার করতে করতে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে চাইল। কিন্তু গতি ওদের অতিরিক্ত ধীর। দৌড়ে পারল না আমাদের সঙ্গে। দেখতে দেখতে সব ক'টাকে 'ফুটো বেলুন' বানিয়ে দিলাম আমরা। চারপাশে তাকিয়ে একটা জীবন্ত দানবকেও আর চোখে পড়ল না।

উত্তেজিত স্বরে চাচী বলল চাচাকে, 'চলো, সময় থাকতে কেটে পড়ি!'

'কিন্তু গাড়ি কই?' মনে করিয়ে দিল চাচা। 'গাড়িটা তো গেছে!'

মনে পড়ে গেল আমার। চেঁচিয়ে বললাম, 'গেটের বাইরে বাস দেখেছিলাম। জলদি চলো।'

'কিন্তু গেট খুলব কি দিয়ে?' রবিনের প্রশ্ন।

মাটিতে পড়ে থাকা নেতার দিকে তাকালাম। তার চুপসানো পকেট থেকে বের করে নিলাম গেটের চাবি। তারপর গেটের দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম সবাই...

*

ঠাস করে একটা শব্দ হলো।

মাথার মধ্যে প্রবল ঘূর্ণিপাক। ধীরে ধীরে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। চারপাশে তাকিয়ে দেখি কবরস্থানে রয়েছি আমি। কবরের মধ্যে। ওপরটা এখন খোলা।

লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলাম কবর থেকে।

দানবের পার্কটা গায়েব।

রাত নামতে শুরু করেছে।

মনে হলো, এতক্ষণ ভয়ানক এক দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

প্রশ্ন জাগল: সত্যিই কি দুঃস্বপ্ন?

স্বপ্ন হোক আর যা-ই হোক, ভীষণ এই কবরস্থানে থাকাটা মনে হয় উচিত হচ্ছে না আর। পা বাড়ালাম বাড়ি যাওয়ার জন্যে। কিন্তু রহস্যটার সমাধান না করে যেতেও ইচ্ছে করছে না। জানতে ইচ্ছে করছে, পার্কটা সত্যি স্বপ্নে দেখেছি, না ইনডিয়ান জাদুকরের কোন কারসাজি ছিল এর মধ্যে?

কেন যেন কবরের পাথরফলকটাকে আবার সোজা করে বসিয়ে দেয়ার তাগিদ অনুভব করলাম ভেতর থেকে।

টেনেটুনে তুলে দিলাম ওটাকে।

বিড়বিড় করে বললাম, 'আরামে ঘুমাও তোমরা, জাদুকর! শান্তিতে থাকো। আর তোমাদের শান্তি বিঘ্নিত করতে আসছি না আমি কোনদিন।'

যেন আমার কথা শুনতে পেল জাদুকর। হাহ্ হাহ্ করে অট্টহাসি শোনা গেল কবরের ভেতর থেকে।

আর দাঁড়ানোর সাহস করলাম না। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝেড়ে দৌড় দিলাম গেটের দিকে। ছুটে বেরোলাম বাইরে।

রাস্তা ধরে বাড়ি যেতে যেতে মনে হলো, না, দুঃস্বপ্ন নয়। ঘটনাটা বাস্তবই ছিল। অলৌকিক, অবিশ্বাস্য কোনও ক্ষমতাবলে আমাকে এক আজব জগৎ থেকে ঘুরিয়ে এনেছে মৃত জাদুকরের জাদুশক্তি। সেই জগৎটা 'মনস্টারল্যান্ড' কিংবা 'ফ্যান্টাসিল্যান্ড' যা-ই হোক।

পৃথিবীতে ব্যাখ্যার অতীত কত আজব ঘটনাই তো ঘটে।

তাই না?

-: শেষ :-

তিন বন্ধু/কিশোর থ্রিলার

যমজ ভূত

রকিব হাসান

কালো হয়ে এল আকাশ।
বাতাস কনকনে।
কুখ্যাত কবরস্থানের পুরানো পাথরগুলোর
মাঝখান দিয়ে হেঁটে চললাম।
বিশাল কবরটা চোখে পড়ল।
এক কবরের দুই ফলক।
দুই জনের নাম।
নিচে একটা পাখির ছবি আঁকা, কাকের মত দেখতে।
তার নিচে লেখা: আমাদের শান্তি ভঙ্গ করতে
চাইলে করো, কিন্তু তারপর যা ঘটবে
তার জন্যে নিজেরাই দায়ী থাকবে।